ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৩ বর্ষ | ২৩তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ আষাঢ়, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ১২ রজব, ১৪৩২ হিজরি | ১৫ ইহ্‌সান, ১৩৯০ হি. শা. | ১৫ জুন, ২০১১ ঈসাব্দ

## ফেব্রুয়ারি ২০১১ : আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ঐতিহাসিক জলসা সালানায় গাজীপুর জলসা গাহে্ হুযূর (আই.)-এর সরাসরি সম্প্রচারিত উদ্বোধনী ভাষণ শুনছেন মন্ত্রমুগ্ধ দর্শকেরা


হুযূর (আই.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ ১৭ পৃষ্ঠায়

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন-
"যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মেনে মারা যাবে সে অজ্ঞতার (জাহেলিয়াতের) মৃত্যুবরণ করবে।"

(মুসনাদ : ইমাম আহমদ বিন হাম্বল)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন-
"আমি তোমাদেরকে মাহদীর সুসংবাদ দিচ্ছি। তিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন সময় আবির্ভূত হবেন, যখন মানুষের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিবে এবং বহু ভূমিকম্প হবে।"

(নাজমুস সাকিব, ২য় খন্ড ১১ পৃ:)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"যখন ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হবেন, মৌলবী-মৌলানারাই তাঁর প্রধান শত্রু হবে। কেননা তাঁরা মনে করবে যে, তাঁকে মানলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকবে না এবং জনসাধারণ ও তাদের মধ্যে পার্থক্য উঠে যাবে।"

-হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবি (রা.) ফতুহাতে মক্কিয়া ৩৭৩ পৃ:

# To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org

www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

Courtesy : **INTERNATIONAL TRADING HOUSE**

207/2, West Kafrul (2nd Floor), Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207.

Phone : 88-02-9113176, Fax : 88-02-8121001, Web : www.ithbd.com, E-mail : tushar@ith.com, info@ithbd.com


Amecon
Since 1985
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

# হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত কাল কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত

mPxc Î

আঁ-হযরত (সা.)-এর নবুওয়াত কাল কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত এবং তিনি (সা.) হলেন খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর) এজন্য খোদা এটা চান নি যে, জাতিসমূহকে একত্বের রূপ দেয়াটা আঁ-হযরত (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই পূর্ণতায় পৌঁছে যাক। কেননা এ অবস্থা ঘটলে, তাঁর (সা.) যুগের পরিসমাপ্তি সাব্যস্ত হয়ে যেতো, অর্থাৎ তাঁর যুগ সে পর্যন্তই পরিসমাপ্ত হয়ে গেছে বলে প্রতিভাত হতো। যদিও, চূড়ান্ত যে কর্ম তাঁর (সা.) সাধন করার ছিল, তা সে যুগেই পরিণতিতে পৌঁছে গিয়েছিল, তবুও খোদা তাআলাই ওই কর্মটি– যাতে সকল জাতি এক জাতির ন্যায় পরিণত হয়ে যাবে আর একই ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তা মুহাম্মদীয় যুগের শেষ অংশে সোপর্দ করেন, যা হলো কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগ। তাই, সেই চূড়ান্ত কর্মের পূর্ণতা দান করতে আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতের মধ্য থেকে একজন স্থলাভিষিক্তকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যিনি **মসীহ্ মাওউদ** নামে আখ্যায়িত হয়েছেন আর তারই নাম **খাতামাল খোলাফা**ও রাখা হয়েছে।

এভাবে মুহাম্মদীয় যুগের শীর্ষে রয়েছেন আঁ-হযরত (সা.) আর শেষে হলেন মসীহ্ মাওউদ। আর এটা অবধারিত ছিল, দুনিয়ায় এ সিলসিলা যেন কর্তিত না হয়, ধ্বংস না হয়, যতদিন না তিনি জন্ম লাভ করেন। কেননা জাতিসমূহকে একত্রিত করার সেবা কর্মটি ওই নবুওয়াতের প্রতিনিধির জিম্মাতে ও দায়িত্বে সোপর্দ করা হয়েছে।

### আল্লাহ্‌র ঘর-পবিত্র কাবাগৃহ হলো কেন্দ্রবিন্দু

আল্লাহ্‌র ঘর-পবিত্র কাবাগৃহ হলো কেন্দ্রবিন্দু আর আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তোমাদেরকে এটারই প্রতিচ্ছায়া নির্মাণ করতে হবে অর্থাৎ অকৃত্রিম ভাবে একই ধাঁচে একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করতে একই ধরণের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতা সৃষ্টি করতে জায়গায় জায়গায় **ছায়া কেন্দ্র** খুলতে হবে, যে গুলো **বায়তুল্লাহ্‌র** প্রতিচ্ছবি হবে আর তা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যও হবে তা-ই, যা **বায়তুল্লাহ্** প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

পবিত্র কাবাগৃহ আদিকালে যেভাবে মানবতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বর্তমানেও তেমনি চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণতার এ যাত্রাকালে খোদার এই পবিত্র গৃহই মনুষ্যত্ব ও মানবতার কেন্দ্র নির্ধারিত হওয়া লক্ষ্য ছিল আর এজন্য নবীগণের নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাব স্থান রূপে বায়তুল্লাহ্‌কেই বেছে নেয়া হয়েছে, যাতে 'মানবতার সকল বৈশিষ্ট্য সমাহারকারী নবী' আর 'সম্মিলিত এক মানবজাতির কিবলা' দু'টোরই সমাবেশ একই স্থানে ঘটে।

('বায়তুল্লাহ্ শরীফ নির্মাণের তেইশটি মহান উদ্দেশ্য' পুস্তক থেকে সংকলিত)

**১৫ জুন ২০১১**


| | |
|---|---|
| **কুরআন শরীফ** | ২ |
| **হাদীস শরীফ** | ৩ |
| **অমৃত বাণী** | ৪ |
| **জুমুআর খুতবা**<br>হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) | ৫ |
| **হযরত তালুত (আ.)-এর ধর্ম প্রচার**<br>সংকলন : মৌ. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন | ১১ |
| **যরাথুস্ত্র ও তার ধর্ম**<br>মোহাম্মদ ফজলুর রহমান | ১২ |
| **আবার 'সত্যের সন্ধানে' অনুষ্ঠান ৭ থেকে ১০ জুলাই, ২০১১** | ১৬ |
| **ইসলামে সামাজিক জীবন**<br>সরফরাজ এম. এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী | ২১ |
| **আল্লাহ্ বিলাসিতা পছন্দ করেন না**<br>মাহমুদ আহমদ সুমন | ২৩ |
| **মুক্তিপ্রাপ্ত দলের সন্ধানে**<br>মুহাম্মদ আমীর হোসেন | ২৪ |
| **আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমেই ইসলামের বিশ্ববিজয়**<br>মোজাফ্ফর আহমদ রাজু | ২৬ |
| **স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল : প্রিয় ভ্রাতা মুহাম্মদ ইয়ামিন স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি**<br>সৈয়দ মমতাজ আহমদ | ২৮ |
| নবীনদের পাতা-<br>**আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন– আত্মোপলব্ধির দিশা** | ৩০ |
| **তাজা ফলের রস : অনেক রোগের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক সুরক্ষা** | ৩০ |
| **সংবাদ** | ৩২ |
| **এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠানসূচী** | ৩৬ |

# কুরআন শরীফ

## সূরা ইউসুফ-১২

قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ﴿۶۲﴾

৬২। তারা বললো, 'আমরা তার পিতাকে তার ব্যাপারে অবশ্যই রাজী করাতে চেষ্টা করবো। আর নিশ্চয় আমরা এ (কাজ) করেই ছাড়বো।'

وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۶۳﴾

৬৩। আর সে তার কর্মচারীদের বললো, 'তোমরা তাদের পুঁজি তাদের মালপত্রের মাঝে রেখে দাও যেন তাদের পরিবারপরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে তারা এ (অনুগ্রহের বিষয়) জানতে পারে। সম্ভবত (এতে করে) তারা আবারো ফিরে আসবে।'

فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿۶۴﴾

৬৪। এরপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল তারা বললো, 'হে আমাদের পিতা আমাদের জন্য (শস্য বরাদ্দের) পরিমাপ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অতএব তুমি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও যেন আমরা আমাদের (শস্য বরাদ্দের) পরিমাপ পেতে পারি। আর আমরা নিশ্চয় তার হিফাজত করবো।'

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۶۵﴾

৬৫। সে বলল, 'আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের ওপর সেভাবেই ভরসা করবো যেভাবে ইতোপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে আমি তোমাদের উপর ভরসা করেছিলাম?' এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ই শ্রেষ্ঠ রক্ষক এবং তিনিই দয়ালুদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿۶۶﴾

৬৬। আর তারা যখন নিজেদের মালপত্র খুলল তখন তারা দেখতে পেল তাদের পূঁজি তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা বললো, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের (আর) কী চাওয়ার আছে? এই দেখ আমাদের পূঁজি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে! আর (আমাদের ভাই আমাদের সাথে গেলে) আমরা আমাদের পরিবারের জন্য শস্যাদি নিয়ে আসবো এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের হিফাজত করবো। আর আমরা আরো এক উট বোঝাই[১৩৯১] (শস্য বরাদ্দের) পরিমাপ বেশি পাব। এ (শস্য বরাদ্দের) পরিমাপ (পাওয়া) অতি সহজ।

১৩৯১। "এক উট বোঝাই" এর অর্থ একটি উট যে পরিমাণ ভার বহন করতে পারে, সেই পরিমাণ বোঝা উটের পিঠের উপরে বহন করে আনা।

# হাদীস শরীফ

## পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ

কুরআন ঃ "তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা এড়িয়ে চল এবং মিথ্যা কথা বলাও পরিহার কর।" (সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩১)

হাদীস ঃ হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদের তিনটি বড় গুনাহ্ সম্বন্ধে অবগত করবো? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন, তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা মাতার অবাধ্যতা করা, তিনি (সা.) তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন, সোজা হয়ে তিনি বসলেন এবং বললেন, খবরদার মিথ্যা কথা বলা থেকে বাঁচো। তিনি (সা.) এ কথাটি পুণঃ পুণঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম, হায়! যদি তিনি (সা.) চুপ করে যেতেন" (বুখারী)।

"তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা এড়িয়ে চল এবং মিথ্যা কথা বলাও পরিহার কর।"

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তাকে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে খোদার নিকট পৌঁছে দিতে চায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছে, মূর্তিপূজা ও মিথ্যাচারিতা ও পিতামাতার অবাধ্য হওয়া তিনটি বড় গুনাহ্ মানুষকে খোদা থেকে দূরে নিয়ে খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং তার আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, অংশীবাদিতা, পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, বাস্তব কথা হলো এই যে, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না। দুনিয়ার হীন ব্যক্তি বলতে পারে যে, মিথ্যা ব্যতিরেকে চলা যায় না। এটা এক অযথা কথা। যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয় তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানেনা যে, খোদার আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাণদাতা ও মা'বুদ মনে করে। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতাকেও বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত পবিত্রতা দান করুন এবং সকলকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

**আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

# অমৃতবাণী

## খোদা আপনাদের প্রতি করুণা করুন

### হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! খোদা আপনাদের প্রতি করুনা করুন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমার প্রভু প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝা আমার জন্য সহজ করেছেন আর জীবন-যাত্রার সব সমস্যা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বিশেষ স্নেহের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন আর আমাকে আমার আমিত্বের গৃহ থেকে মুক্ত করে সংগোপনে আমাকে তাঁর সুমহান ও বিশাল গৃহ অভিমুখে নিয়ে গেছেন।

জল-স্থল পাড়ি দিয়ে যখন আমি প্রকৃত ক্বিবলায় পৌঁছলাম এবং তাঁর মনোনীত গৃহ প্রদক্ষিণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম আর আমার বন্ধু ও মূর্তিমান ভালবাসা, প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র স্নেহের সুদৃষ্টি, অন্তরাত্মার প্রখরতা ও আধ্যাত্মিক রহস্যকে বুঝার ক্ষেত্রে যখন আমাকে বিশেষত্ব প্রদান করল আমি তখন আমার পূর্ণ অস্তিত্বকে তাঁর হাতে সঁপে দিলাম।

আমি তাঁর পক্ষ থেকে সব সূক্ষ্ম বিষয় ও আধ্যাত্মিক রহস্যের জ্ঞান অর্জন করেছি। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে ব্যুৎপত্তি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে বিদ্যমান সব বিবাদের প্রতি আমি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করছি। আমি সব বিতর্কের উৎস ও কারণ সন্ধান করেছি। অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্ষেত্র বাদ রাখিনি বরং সুনিশ্চিতভাবে আমি এর মূল খুঁজে বের করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি, বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মানুষ যে ভুল-ভ্রান্তি করেছে, একটি দিককে উপেক্ষা করে অন্য আরেকটি দিককে অবলম্বন করাই হলো এর মূল কারণ।

প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই তারা একটি আঙ্গিককে বড় করে দেখে আর এর বিপরীত মতামতকে তুচ্ছ ও খাটো মনে করে। কাঙ্খিত কোন কিছুর ভালবাসায় মত্ত হলে প্রবৃত্তি এর বিরোধী সব বিষয়কে ভুলে বসে–এই হলো মানবস্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তখন সে সহানুভূতিশীলদের সদুপদেশকেও মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না বরং বেশীর ভাগ সময় তাদের বিরোধিতা করে আর তাদেরকে শত্রু মনে করে। তখন সে তার হৃদয়ের অস্বচ্ছতার কারণে তাদের সান্নিধ্যে যায় না আর তাদের কথাও মন দিয়ে শোনে না।

এ আত্মিক বিপত্তির নানা কারণ ও হেতু রয়েছে আর বিভিন্ন পথ ও পন্থা দিয়ে এ ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটে। এর সবচেয়ে বড় কারণগুলো হলো, হৃদয়ের কাঠিন্য, পাপে আসক্তি, পরকালে জবাবদিহিতার প্রতি ঔদাসীন্য এবং প্রতারক ও মিথ্যাবাদী শত্রুদের সাথে সখ্যতা। মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া তার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয় আর প্রবৃত্তির দাসত্বই তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পরিণত হয়। অতএব আমরা এমন স্থায়ী পদস্খলন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। প্রায়শ এসব বদ-অভ্যাসই মানুষকে বিবাদ-বিতন্ডার সময় গভীর হঠকারিতার পথে ঠেলে দেয়। সত্যান্বেষী ও হেদায়াত সন্ধানী একজন মানুষের জন্য কু-প্রবৃত্তির খাতিরে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে জীবননাশী এক বিষ। এ ফাঁদে পতিত মানুষ খুব কমই রক্ষা পায়। কখনও কখনও এসব অসৎ কারণ এবং বিভ্রান্তিকর হেতুগুলো প্রচ্ছন্ন ও দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ তা দেখতে পায় না আর মনে করে, সে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করছে। সে তড়িঘড়ি করে যখন বিতন্ডায় লিপ্ত হয় আর বিবাদ-বিসম্বাদে ক্রমশঃ উগ্র হয়ে উঠে, এমন ক্ষেত্রে প্রায়শই একটি তুচ্ছ ধারণা এবং দুর্বল অভিমতকে জোরালো ও অকাট্য প্রমাণ বলে মনে করে, যার ফলে তার চালচলনে অহংকারীর হাবভাব দেখা যায়। এসব কিছুর কারণ হলো, গভীর মনোযোগের অভাব, অন্তর্দৃষ্টিহীনতা, সত্য-জ্ঞানের স্বল্পতা, সামাজিক কদাচারের দাসত্ব, রিপুর পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার, আধ্যাত্মিক রুচিশূন্যতা, উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে নৈরাশ্য এবং জড় জগতের প্রতি পূর্ণ আসক্তি এবং এর অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ।

['সির্‌রুল খিলাফাহ্' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা-১৩-১৪]

# জুমুআর খুতবা

## সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ২২ এপ্রিল, ২০১১-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

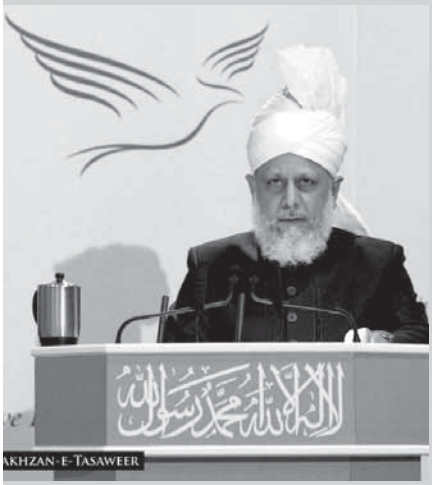


أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

**আজ আমি তোমাদের কল্যানের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি আর তোমাদের উপর নিজের দয়াকে পূর্ণ করে দিয়েছি আর তোমাদের জন্য ধর্ম হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যখন এ ঘোষনা দিয়েছিলেন তখন বস্তত: সেটি ছিল সব কিছু প্রতিষ্ঠার যুগ। অতএব কোন আহমদীর এ বিষয়ে সামান্য পরিমাণ সন্দেহ নেই, না কখনোও চিন্তায় আসে যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নতুন কোন বিষয় নিয়ে এসেছেন।**

**তিনি (আ.) তো সেই ঈমান, সত্যতা এবং তাকওয়াকে পুণরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কুরআনে করীম এবং আঁ-হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আসার ছিলেন আর এসেছেন। আঁ-হযরত (সা.) যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুসলমানদেরকে নিজেদের মন্দ কৃতকর্মের কারণে তা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়েছিল।**

তাশাহ্হুদ, তা'উয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, "আমি প্রেরিত হয়েছি যেন পূণরায় ঈমান এবং সত্যতার যুগ আগমন করে আর হৃদয়ে তাকওয়া সৃষ্টি হয়"। (কিতাবুল বারিয়াহ্, রূহানী খাযায়েন ১ম খন্ড, পৃষ্টা-২৯৩, টীকা)

একজন আহমদী যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বয়আতের সিলসিলায় দাখেল হওয়ার দাবী করেন তার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বর্ণনাকৃত এ শব্দ গুলোকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। এতে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। এ (শিক্ষা) অনুযায়ী নিজের জীবন গড়ার চেষ্টা করা উচিত। আর যখন একজন আহমদী এ গুলো সম্পাদন করতে থাকবে সেটি তাকে বয়আতের হক আদায়কারী সাব্যস্ত করবে। নতুবা একটি দাবী সর্বস্ব হবে যে, আমরা আহমদী।

সেই সত্যতা এবং ঈমান যা হযরত মসীর্হ মাওউদ (আ.) সৃষ্টি করতে চান বা যার জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন, (সেটি হচ্ছে) যেন হৃদয়ে তাকওয়ার সৃষ্টি হয়। এটি কোন নতুন জিনিস নয়, যেমন কিনা তাঁর এ বাক্য থেকে স্পষ্ট, "পূণরায় ঈমান এবং সত্যতার যুগ আগমন করবে " অর্থাৎ এ ঈমান, সত্যতা এবং তাকওয়ার যুগ কোন সময়ে ছিল, যা এখন হারিয়ে গেছে। আর পূণরায় এটিকে ফিরিয়ে আনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাজ।

আমরা সকলে যে ভাবে জানি ঈমান, সত্যতা এবং তাকওয়া প্রতিষ্ঠার যুগ নিজের সর্বউচ্চ মর্যাদায় সে সময় এসেছিল যখন আল্লাহ্ তাআলা আমাদের আকাঁ ও মাওলা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করে শরীয়ত পূর্ণাঙ্গিন করে দিয়ে ঘোষণা দেন,

**"আল ইয়ামা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নে'মাতি ওয়া রাযীতু লাকুমুল্ ইসলামা দ্বীনা।"**

যে, আজ আমি তোমাদের কল্যানের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি আর তোমাদের উপর নিজের দয়াকে পূর্ণ করে দিয়েছি আর তোমাদের জন্য ধর্ম হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যখন এ ঘোষনা দিয়েছিলেন তখন বস্তত: সেটি ছিল সব কিছু প্রতিষ্ঠার যুগ। অতএব কোন আহমদীর এ বিষয়ে সামান্য পরিমাণ সন্দেহ নেই, না কখনোও চিন্তায় আসে যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নতুন কোন বিষয় নিয়ে এসেছেন।

তিনি (আ.) তো সেই ঈমান, সত্যতা এবং তাকওয়াকে পুণরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কুরআনে করীম এবং আঁ-হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আসার ছিলেন আর এসেছেন। আঁ-হযরত (সা.) যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুসলমানদেরকে নিজেদের মন্দ কৃতকর্মের কারণে তা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়েছিল।

তাই আমরা আহমদীগণ যখন এটি বলি যে, আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনেছি তখন আমাদের দেখতে হবে, আমরা কি নিজেদের মধ্যে সেই ঈমান সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি যার শিক্ষা কুরআন করীম

দিয়েছিল আর যা সাহাবাগণ নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন? আমরা কি নিজেদের মাঝে সেই সত্যতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছি বা করছি যাকে আঁ-হযরত (সা.)-এর যুগে মু'মিনদের বড় একটি সংখ্যা নিজেদের মাঝে পরিবর্তন এনে সৃষ্টি করেছিলেন? আমরা কি নিজেদের হৃদয়ে সেই তাকওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি যার বর্ণনা আমরা সাহাবা (রা.)-এর জীবনিতে পড়ে এবং শুনে থাকি? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তো নিজের এবং নিজ সাহাবাদের জীবদ্দশায় এ পরিবর্তন সাধন করেছিলেন।

আমি যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের ঘটনা বর্ণনা করি তখন এ উদ্ধৃতির আলোকেই করে থাকি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে এ বাক্য লিখেছেন, "আমি প্রেরিত হয়েছি যেন পুণরায় ঈমান এবং সত্যতার যুগ আগমন করে আর হৃদয়ে তাকওয়া সৃষ্টি হয়"। অত:পর কয়েকটি লাইন ছেড়ে দিয়ে তিনি বলেন, "সুতরাং এ কাজ গুলোই হচ্ছে আমার স্বত্ত্বার মূল উদ্দেশ্য।"

(কিতাবুল বারিয়াহ্, রূহনী খাযায়েন ১৩তম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৩, টীকা) অর্থাৎ তাঁর স্বত্ত্বা ও অস্তিত্বের আসল এবং মৌলিক বিষয়। সুতরাং তিনি যখন তাঁর মান্যকারীদের এক স্থানে সম্বোধন করে বলেন, "আমার বৃক্ষরূপ অস্তিত্বের সজীব শাখা প্রশাখা সমূহ" (ফতেহ্ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪) তাই এই যে কাজ যার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, এ কাজ গুলো সম্পাদনকারীই তাঁর অস্তিত্বের সজীব শাখা হতে পারেন। কেননা তিনি তাঁর স্বত্ত্বার এটিই মৌলিক উদ্দেশ্য আখ্যা দিয়েছেন।

এটি তো সম্ভব নয় যে, একটি সুমিষ্ট ফল দায়ক বৃক্ষের কতক ডাল-পালা বিষাক্তফল দিতে আরম্ভ করবে বা শুকনা ডাল ঐ বৃক্ষের অংশ হবে। শুকনো ডালকে কখনো এর মালিক থাকতে দেয় না বরং কেটে পৃথক করে দেয়। সুতরাং এটি অত্যন্ত ভয়ের জায়গা, আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে বয়আতের পর আমাদের দায়িত্ব কী? যারা নতুন বয়আত করে জামাতে অন্তভূর্ক্ত হচ্ছেন, আমি তাদের অবস্থা এবং ঘটনা সমূহ যখন শুনি বা পত্রে পাঠ করি তখন নিজের ঈমানও বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে এমন অনেক আছেন যাদের বাপ-দাদা আহ্‌মদী ছিলেন তাদের কতকের অবস্থা সম্পর্কে যখন জানতে পারি যে, তাদের হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ইচ্ছা অনুযায়ী যেভাবে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন সেভাবে ইসলামী শিক্ষা সমূহে আমল করার দিকে দৃষ্টি নেই। কতক দূর্বলতা সৃষ্টি হচ্ছে যা দেখে দু:খ এবং কষ্ট হয়। জন্মগত আহমদী হওয়া অনেক সময় অনেকের মাঝে দূর্বলতা সৃষ্টি করে দেয়। তাই আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের হৃদয়কে পরখ করে নিজের যাচাই বাছাই করা প্রয়োজন। নিজের হৃদয়কে পরীক্ষা করতে থাকা প্রয়োজন, আমরা কোথাও তো এমন দূর্বলতার দিকে ধাবিত হচ্ছি না যা খোদা না করুন ফিরত আসার রাস্তাই বন্ধ করে দিবে বা কোথাও আমরা নাম সর্বস্ব আহমদী তো রয়ে যাচ্ছি না?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর বর্ণনা এবং লিখনি সমূহের বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আহমদীয়াতের প্রকৃত মর্ম তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন আমরা নিজেদের যাচাই বাছাই করতে থাকব আর আমাদের কথা ও কাজে কোন পার্থক্য থাকবে না। তিনি আমাদের ও অন্যদের মাঝে একটি পরিস্কার পার্থক্য দেখতে চান।

এক জায়গায় তিনি বলেন, আমি বারংবার কয়েক জায়গায় বলেছি, বাহ্যত: নামে আমাদের জামাত এবং অন্য মুসলমান উভয়তো একই। তোমরাও মুসলমান, তারাও মুসলমান আখ্যায়িত হচ্ছে। তোমরা কলেমা পড়, তারাও কলেমা পড়ে। তোমরাও কুরআনের অনুসরনের দাবী কর, তারাও কুরআনের অনুসরনেরই দাবী করে। বস্তুত: দাবীর দিক থেকে তো তোমরা এবং তারা উভয়ে সমান।

কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা কেবল দাবীতে সন্তুষ্ট হন না, যতক্ষন পর্যন্ত এর সাথে কোন বাস্তবতা না থাকে আর দাবীর সমর্থনে কার্যত কিছু প্রমাণ এবং পরিবর্তনের দলিল না থাকে। (তিনি বলেন, দাবীর সমর্থনে কার্যত কিছু প্রমান আর পূণরায় সেটি দাখিল থাকা প্রয়োজন। দাবীর সমর্থনে বাস্তব যে পরিবর্তন সেটি যেন দৃষ্টিগোচরও হয়, সেটি যেন পরিস্কার প্রকাশও পায়, যা তার দলিল হবে।) অত:পর তিনি বলেন, এ কারণে অধিকাংশ সময় এ দু:খে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়।"

(মলফুযাত ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬০৪, নতুন সংস্করণ)

তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা কেবল দাবীতে সন্তুষ্ট হন না যতক্ষন পর্যন্ত কোন বাস্তবতা সাথে না থাকে আর দাবীর সমর্থনে কিছু বাস্তব প্রমাণ আর অবস্থা পরিবর্তনের দলিল না থাকে। এ কারণে অধিকাংশ সময় এ দু:খের কারনে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়।"

সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের নিকট কার্যত প্রমাণ চান। তাই আমরা নিজেরা যদি নিজেদের অবস্থা সমূহের পর্যালোচনা করি তাহলে অনেক উত্তম ভাবে নিজেদের বিশ্লেষণ করতে পারব। অনেক সময় অন্যদের বলার প্রেক্ষিতে মানুষ বিরক্ত হয়ে যায় বা কতক সময় বুঝানোর প্রেক্ষিতে আত্মম্ভরিতার প্রশ্ন এসে যায়। কিন্তু শর্ত হচ্ছে নিজের পর্যালোচনার জন্য সর্বদা এটি দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রতি মূহুর্ত আমাকে দেখছেন, আর আমি বয়আতে একটি অঙ্গিকার করেছি, যা পূর্ণ করা আমার দায়িত্ব। তাহলে উত্তমভাবে মানুষ নিজের পর্যালোচনা করতে পারবে।

একজন আহমদী সে যতই দূর্বল হোক না কেন তারপরও তার মাঝে পুণ্যের কিছু ঝলক থেকে থাকে। যখনই অনুভূতি জাগ্রত হয় তখন পুণ্যের কলি প্রস্ফুটিত হতে আরম্ভ করে। তাই প্রত্যেককে কর্মের পানি সিঞ্চনে এ পূণ্যকে জীবিত রাখা প্রয়োজন, সেটিকে সজীব রাখা প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ব্যাথাকে অনুভব করা প্রয়োজন। যাদের অনুভূতি জাগ্রত হয় তাদের অবস্থা দেখতে দেখতে শুকনা ডাল থেকে সজীব ডালে রুপান্তরিত হতে আরম্ভ করে।

অনেকে আমাকে পত্র লিখে থাকেন, পত্রে এ আবেগ থেকে থাকে যে, আমাদের মাঝে যেন সেই পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয় যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চেয়েছেন। সুতরাং যে নিজের অনুভূতিকে জাগ্রত রাখার চেষ্টা করে আর আল্লাহ্ তাআলা থেকে সাহায্য চায়, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা যিনি মায়ের চেয়েও অধিক নিজের বান্দাদের ভালবাসেন, নিজের দিকে আগমনকারীকে দৌড়ে এসে নিজের সাথে চিমটে নেন, তখন এমন মানুষের অস্তিত্বই পরিবর্তীত হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নিজেদের ইহজগত এবং পরজগতকে সুসজ্জিত করার একটি স্বর্ণালী সুযোগ দিয়েছেন, আমরা যদি এ থেকে সঠিকভাবে উপকৃত না হই তাহলে এটি আমাদের দূর্ভাগ্য হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর থেকে সরাসরি কল্যাণ লাভকারী সাহাবাগণ বিদ্যমান অবস্থায় নিজের দু:খ এবং ব্যাথার প্রকাশ করেছিলেন। তাদের পদমর্যাদার দৃষ্টান্ত যখন আমরা পড়ি বা শুনি তখন ঈর্ষা হয়, কি অদ্ভুত

পরিবর্তন তারা নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন। তথাপি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ব্যাকুলতাকে লক্ষ্য করুন, তাঁর তাকওয়ার সেই মাপকাঠিকে দেখুন যা তিনি তাঁর মান্যকারীদের থেকে প্রত্যাশা করেছেন। ঐ সময়ও কতকের অবস্থা দেখে তিনি বলেছেন, 'এ চিন্তায় আমার কঠিন দু:খ হয়।' তাই আমাদের দূর্বলতার অবস্থা কি পরিমাণ দু:খের কারণ হতে পারে। যদিও তিনি (আ.) আজ আমাদের মাঝে সেভাবে বিদ্যমান না তথাপি আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিকট আমাদের অবস্থা প্রকাশ করতে পারেন যে, কোন কোন সাহাবী, বুযূর্গ বা তাঁর নিকট আত্মিয়দের সন্তানদের কি কি অবস্থা? সেই মানুষ যারা খোদা তাআলার সন্তুষ্টির জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে মন্দ পরিবেশ থেকে পৃথক হয়ে, নিজের জগতকে ছেড়ে হযরত মসীহ্ (আ.)-এর স্বত্ত্বার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এ প্রতিজ্ঞার সাথে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেন যে, সর্বদা ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিব। তাদের কতকের সন্তানদের ধর্মীয় অবস্থা দুর্বল হয়ে গেছে আর কতকের এ বিষয়ে চিন্তাও নেই। সুতরাং আমাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য নিজেদের বুযূর্গদের এ নিয়্যত থেকে প্রেরণা লাভ করতে থাকা উচিত।

আমাদের সম্মুখে একটি উদ্দেশ্য থাকা উচিত যা আমরা অর্জন করব। তাদের জীবনের দিকগুলো নিয়ে চিন্তা করা উচিত। তাদের বয়আতের কারণ সমূহ জানা উচিত। তাহলেই আমরা কোন উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারব আর তাদের আকাঙ্খাকে পূর্ণকারী হতে পারব।

কিছুদিন পূর্বের কথা, আমাদের একজন পুরনো বুযূর্গ ছিলেন আব্দুল মুগনী খান সাহেব। তাঁর ছেলে তাঁর সম্পর্কে আমাকে বলছিলেন যে, তিনি আলিগড় ইউনিভার্সিটি থেকে ক্যামেষ্ট্রিতে বি. এসসি করেছিলেন। সে যুগে মুসলমান ছেলেরা সাইন্স কমই পড়ত। তাই ভাইস-চেন্সেলার তাঁকে বললেন তুমি এটি ভাল বিষয়ই নির্বাচন করেছ আর উত্তম সফলতাও লাভ করেছ। আমরা তোমাকে ইউনিভার্সিটিতে চাকুরি দিচ্ছি, সাথে পড়াও জারী রেখো। তাঁর পিতামহ কোন ইংরেজ বন্ধুকে সুপারিশ করে রেখেছিলেন, (সে যুগে ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজত্ব ছিল) তিনিও কোন ভাল চাকুরির প্রস্তাব দিয়েছিল।

অত:পর তাঁকে এ পরামর্শও দেয়া হয় যে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে পরীক্ষা দিয়ে এতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও। খান সাহেব সে সময় কাদীয়ানে এসেছিলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর যুগ ছিল, তিনি তাঁকে সবগুলো বিষয় বললেন আর সে সাথে নিবেদন করলেন, হুযুর আমি তো বৈষয়িকতায় পড়তে চাই না। আমি যদি কাদিয়ানে থেকে কাদিয়ানের অলি গলি ঝাড়ু দেয়ারও কাজ পাই তাহলে সোটিকে এ উন্নত চাকুরী গুলোর তুলনায় প্রাধান্য দিব। সুতরাং এমন বূযূর্গও ছিলেন যারা সাহাবা থেকে কল্যাণ লাভ করেছিলেন। অত:পর তাঁকে স্কুলে সাইন্সের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, পরে নাযের বায়তুল মাল নির্বাচিত হয়েছিলেন সম্ভবত প্রথম নাযের বায়তুল মাল ছিলেন। যাই হোক পুরানো বুযূর্গগণ আর বিশেষ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবাগণ পুণ্যে অগ্রগামী ছিলেন। তথাপি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কয়েকজনের দূর্বল অবস্থাও দেখে বলেন, 'আমরা আত্মিক কষ্ট পাই'।

সুতরাং আমাদের নিজেদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেয়া অত্যধিক প্রয়োজন। আমরা যদি চিন্তা করি আমরা কাদের বংশধর। আমাদের বুযূর্গ-গন আহমদীয়াত গ্রহনের পর নিজেদের মাঝে কি পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিলেন। যদি আমরা এ বিষয়ে চিন্তা করি আর এ প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরা নিজেদের বুযূর্গদের নামকে কখনো কলঙ্কিত হতে দেব না তাহলে এই যে সংশোধনের পদ্ধতি এটি নিজেই উত্তমভাবে আমাদের তাকওয়ার পদমর্যাদাকে উন্নত করবে। আমাদের পুণ্য সম্পাদনের দিকে আকৃষ্ট করবে। জীবিত জাতির এটিই নিদর্শন হয়ে থাকে যে, তাদের পুরানোগণও নিজেদের ঐতিহ্যকে নি:শেষ হতে দেন না আর ভাল থেকে ভাল উন্নতির অনুসন্ধান করেন। নিজেদের পদমর্যাদাকে উন্নত করতে থাকেন।

নতুন আগতগণও একটি নতুন উদ্দীপনা নিয়ে জামা'তে প্রবেশ করে, তাঁরা যখন পুরানোদের উন্নত মর্যাদা দেখে তখন আরও প্রতিযোগীতার রুহ সৃষ্টি হয়। আর এভাবে জাতীয় পর্যায়ে পূণ্যের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং আমরা যখন এ দাবী করি যে, আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে আমাদের অবস্থা সমূহেরও পরিবর্তন করব আর পৃথিবীতেও একটি পরিবর্তন আনব তাহলে এর জন্য স্থায়ী পর্যবেক্ষনের প্রয়োজন হবে। কেবল নিজের পর্যালোচনা করলেই হবে না, নিজ স্ত্রী-সন্তানদেরও পর্যবেক্ষন করতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, "স্ত্রী নিজের স্বামীর কথা, কাজ এবং অবস্থার সর্বাধিক বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। পুরুষ যদি সঠিক হয় তাহলে মহিলাও সঠিক হবে।

নতুবা তাকে (পুরুষকে) দর্পন দেখাবে যে, আমার সংশোধনের কি চেষ্টা করছ, প্রথমে তো নিজের অবস্থার পরিবর্তন কর। তাই মহিলাদের সংশোধনের জন্য আবশ্যক যে, পুরুষকে নিজের অবস্থাতেও পবিত্র পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, মহিলাদের সংশোধন হয়ে গেলে আগত প্রজন্মের সংশোধনেরও জামানত এসে যায়। সুতরাং আগত বংশধরদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য তাদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য পুরুষের নিজের অবস্থার দিকে সর্বাধিক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। অত:পর এই যে, মহিলা-পুরুষের দৃষ্টান্ত, পিতা-মাতার দৃষ্টান্ত, স্বামী-স্ত্রীর দৃষ্টান্ত এগুলো সন্তানদেরও দৃষ্টিএদিকে আকৃষ্ট করবে যে, আমাদের আসল উদ্দেশ্য পৃথিবীতে মজে যাওয়া নয় বরং খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

এখানে একটি বিষয়ের ব্যাখ্যাও করে দিতে চাই, কেউ যেন মনে না করেন নাউযুবিল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাহাবাদের মাঝে অনেক দুর্বলতা ছিল বা কিছু সংখ্যায়ও এমন ছিলেন যার কারণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এটি বলতে হয়েছিল। যেভাবে পূর্বেও আমি বলেছি, সম্ভবত গুটিকতকই এমন হবেন যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মাপকাঠির নিরীখে উত্তীর্ণ হতে পারেননি তথাপি তিনি গুটি কতকের মাঝেও দুর্বলতা দেখতে চান নি।

সেই মজলিস যেখানে তিনি কতককে দেখে তার মনোবেদনার উল্লেখ করেছেন, (সেখানে) তিনি কতককে দেখে এটিও বলেছেন, "আমরা দেখছি এ জামা'ত নিষ্ঠা ও ভালবাসায় অনেক উল্লেযোগ্য উন্নতি করেছে। অনেক সময় জামাতের নিষ্ঠা, ভালবাসা এবং ঈমানের আবেগ দেখে আমরা নিজেরা বিস্ময়াভিভূত ও আশ্চর্যান্বিত হই।" (মলফুযাত ৫ম খন্ড, পৃষ্টা-৬০৫, নতুন সংস্করণ)

সুতরাং ঈমানের আবেগ প্রদর্শনকারীও অনেক ছিলেন বরং অধিকাংশই (এমন) ছিলেন বরং আমাদের তো এটি বলা উচিত যে, আমাদের তুলনায় সব (সাহাবা এমন ঈমানের আবেগ প্রদর্শনকারী) ছিলেন। কিন্তু নবী নিজের জামাতে উন্নত পদমর্যাদা দেখতে চান। আমারা যে যুগ অতিবাহিত করছি এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এরই যুগ, এযুগে এখনও খোদা তাআলার অনেক ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ পূর্ণ হওয়ার আছে। তাঁর সাথে আল্লাহ্

তাআলা যে ওয়াদা করেছিলেন এখনও অনেক পূর্ণ হওয়া অবশিষ্ট আছে।

তাই আমরা যদি চাই যে, সে ওয়াদা গুলো সত্বর আমাদের জীবণে পূর্ণ হোক তাহলে আমাদেরকে সততা, ঈমান এবং তাকওয়ার মানের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। আমরা যখন আল্লাহ্ তাআলার নিকট এ আকাঙ্খা রাখি যে, তিনি আমাদেরকে জামাতি উন্নতি প্রদান করুন তাহলে (সেই সাথে) আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভেরও চেষ্টা করতে হবে।

এটিও বলে দিতে চাই, এ যুগেও আল্লাহ্ তাআলার ফযলে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় অনেক মানুষ এগিয়ে আছে আর ভবিষ্যত বংশধরের মাঝেও এ প্রেরণা যোগাচ্ছেন। আমি একদা পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য লাহোরের ঘটনার পর এ চিন্তার বহি:প্রকাশ করেছিলাম যে, খোদ্দাম বা সওফে দওম-এর আনসারগণও যারা জামাতের স্থাপনা এবং মসজিদ সমূহে ডিউটি দিচ্ছেন, তাদের মধ্য থেকে কতক সম্পর্কে এ সংবাদ রয়েছে যে, একটি দীর্ঘ সময় ডিউটি দেয়ার কারণে তাদের পক্ষ থেকে ক্লান্তির অনূভব বা আকর্ষন হীনতা প্রকাশ পায়।

এ কারণে এদিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন অথবা ব্যবস্থাপনাকে অন্য কোন পদ্ধতিতে এ সম্পর্কে চিন্তা করা প্রয়োজন। সদর খোদ্দামূল আহমদীয়া পাকিস্তান যখন এ বিষয়টি নিজের খোদ্দামদের পর্যন্ত পৌছালেন তখন আমার কাছে খোদ্দামূল আহমদীয়া পাকিস্তানের পক্ষ থেকে নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা পূর্ণ কতক পত্র আসল যে, আমরা নতুন করে নিজেদের প্রতিজ্ঞার নবায়ন করছি।

আমরা পূর্বেও কখনো ক্লান্ত হইনি আর ইনশাল্লাহ্ না আগততে কখনও এমন চিন্তা সৃষ্টি করব যে, জামাতি ডিউটি আমাদের জন্য কোন বোঝা। আপনি নিশ্চিত থাকুন, তদ্রুপভাবে মহিলাদের পত্র আসল, আমাদের ভাই, স্বামী বা সন্তান নিজেদের কাজ থেকে ফিরে এসে তৎক্ষনাৎ জামাতী ডিউটি সমূহে চলে যায় আর আমরা সানন্দে তাদের বিদায় দেই। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে আমাদের একাকিত্বে থেকেও কোন ধরনের ভয় নেই।

সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেমন বলেছেন, এ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা ঈমানের আবেগের কারণে। এ সম্পর্কে এটিও স্মরণ রাখবেন এ কর্তব্য সমূহ এবং ডিউটির মাঝে নিজের খোদাকে কখনও ভুলবেন না। নামাযগুলো সময়মত আদায় করবেন আর ডিউটির সময় যিকরে এলাহী এবং দোয়ার দ্বারা নিজেদের জিহ্বাগুলোকে সতেজ রাখবেন।

আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে খোদা তাআলার স্বত্ত্বা। আমাদের যে সাহায্য লাভ হবে তা খোদা তাআলা থেকে লাভ হবে। আমরা তাঁর নির্দেশে সামান্য চেষ্টা করছি, যা কিছু করার সেটিতো প্রকৃত পক্ষে খোদা তাআলাই করবেন। তাই যখন খোদা তাআলার সাথে চিমটে যাবেন তখন খোদা স্বয়ং শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন। তার হাত কে বিরত রাখবেন। তাই দোয়াতে কখনো অলস হবেন না। অত:পর এ ইবাদত, দোয়া এবং যিকরে এলাহী-এর ফল বাস্তবে যখন সাধারণ অবস্থায়ও প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব থেকে প্রকাশিত হতে থাকবে তাহলে তখনই আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বর্ণিত পদ মর্যাদাকে লাভ করতে পারব।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ۝

(সূরা আন-নাহল-১২৯)

তাকওয়া, পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন কারী খোদা তাআলার সমর্থনের ভিতর থাকেন আর তারা সবসময় অবাধ্য হওয়ার ভয়ে ভীত এবং কম্পমান থাকেন।" (ভয় করেন এবং আতঙ্কে থাকেন।)

(মলফুযাত ৫ম খন্ড, পৃষ্টা-৬০৬)

সুতরাং সর্বদা আল্লাহ্ তাআলার তাকওয়া ও ভয়ই বান্দার হেফাযতও করে আর তাকে পার্থিব ভয় থেকেও রক্ষা করে। তাই একজন আহমদীর যদি ভয় থাকে যে কোথাও তিনি যেন আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে যান (তা হলে তারা রক্ষা পাবে)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি (যেন) আমার জামা'তকে সংবাদ দেই, যারা এমন ঈমান এনেছেন যার সাথে পার্থিব মিশ্রণ নেই আর সেই ঈমান কপটতা বা ভীরুতায় কর্দমাক্ত নয়, আর সেই ঈমান আনুগত্যের কোন পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিত নয়। এমন মানুষ খোদার প্রিয় পাত্র। খোদা বলেন, তাদের পদচারণা সত্যের পদচারণা।

(আল-ওসিয়্যত পুস্তিকা রূহানী খাযায়েন ২য় খন্ড, পৃষ্টা-৩০৯)

সুতরাং এটি হচ্ছে ঈমানের মাপকাঠি যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চান। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের তৌফিক দিন আমরা যেন এ মাপকাঠি নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে পারি।

এখানে আনুগত্যেরও বর্ণনা এসেছে, এ সময় আমি আনুগত্যের আলোকে কিছু বলতে চাই। হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) বলেন, আনুগত্যের কোন পদমর্যাদা থেকেও বঞ্চিত না হয়। আনুগত্যের বিভিন্ন ধরণ এবং পদ মর্যাদা রয়েছে যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। আনুগত্যের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, জামাতের ব্যবস্থাপনার আনুগত্য, আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ সমূহের উপর আমল করাও আনুগত্য। তদ্রুপভাবে মানুষ আরও অনেক বিষয়াবলী চিন্তা করে আর প্রত্যেক জিনিষকে একটি ব্যবস্থাপনার অধীন করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনার পূর্ণ আনুগত্য করে। আল্লাহ্ তাআলার অধিনস্ত হওয়ার জন্য কেবল আনুগত্যই এমন মাধ্যম যার দিকে দৃষ্টি থাকলে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকবে। উদাহরণ এটির স্বরূপ আনুগত্যের মাপকাঠি সর্বোৎকৃষ্ট একটি অবস্থা আমরা জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর জীবনিতে দেখতে পাই।

যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর টেলিগ্রাম আসল, তৎক্ষণাত এসে যাও তখন তিনি তার দাওয়াখানায় (নিজের ক্লিনিকে) বসেছিলেন, সেখান থেকেই দ্রুত রওয়ানা হয়ে গেলেন। এই আহ্বান এ শহর থেকে আসেনি যে, ঐ-ভাবে (প্রস্তুত বিহীন অবস্থার) উঠে চলে গেলেন। বরং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিল্লিতে ছিলেন, আর হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) কাদিয়ানে ছিলেন ঘরের লোকদের সংবাদ পাঠালেন আমি যাচ্ছি, কোন পথ খরচ, অন্য খরচ, কাপড় জিনিস-পত্র ইত্যাদির পেকিং করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। সোজা ষ্টেশনে পৌছে গেলেন, গাড়ী কিছু লেট ছিল তখন একজন ধনাঢ্য পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাত হল।

তিনি নিজের রুগীকে দেখাতে চাইলেন আর অনুরোধ করলেন। গাড়ী লেট থাকার কারনে তিনি রুগীকে দেখলেন। সেই রুগীকে দেখার যে ফিস তিনি পেলেন সেটিই তাঁর সফরের খরচ হয়ে গেল। এ ভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর ব্যবস্থা করে দিলেন আর তিনি নিজের মনিবের খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলেন। যখন সেখানে পৌছলেন তখন জানতে

পারলেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এভাবে বলেননি যে, তৎক্ষনাত এসে যান। টেলিগ্রাম লেখক টেলিগ্রামে লিখে দিয়েছেন 'সত্বর পৌছেন'। তথাপি কোন অভিযোগ নেই যে, এভাবে আমি এসেছি, আমাকে কেন কষ্ট দেয়া হল। অত্যন্ত আনন্দের সাথে সেখানে বসে গেলেন।

(হায়াতে নূর পৃষ্ঠা-২৮৫ থেকে সংকলিত)

এ হচ্ছে উচ্চ মার্গের আনুগত্যের মাপকাঠি, নির্দেশের সম্মুখে অন্যসব চিন্তা ভাবনা মূল্যহীন। অত:পর যে ভাবে আমি বলেছি আল্লাহ তাআলারও এ ব্যবহার যে, সাথে সাথে ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন, আর এরা এমনই মানুষ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা নিজের অভিরুচি প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এটি আমাদের জন্যও আদর্শ।

অত:পর জমা'তের ব্যবস্থাপনা রয়েছে, এতে ছোট ছোট কর্মকর্তা থেকে যুগ খলীফা পর্যন্ত আনুগত্য। বস্তুত: এটি আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্যের ধারাবাহিকতা। যেমন কিনা আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে আমার আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে, আর যে আমার আনুগত্য করে সে খোদা তাআলার আনুগত্য করে।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল ৩য় খন্ড, পৃষ্টা-৪৯, মসনদ আবু হুরায়রা হাদীস-৭৩৩০)

সুতরাং জমা'তের ব্যবস্থাপনার আনুগত্যে মৌলিক বিষয়কে লাভ করার জন্য ছোট থেকে ছোট স্তর পর্যন্তও আনুগত্য অত্যধিক আবশ্যক। কোন জামা'ত অথবা জাগতিক দৃষ্টি কোন থেকে দেখলে দেখা যাবে পার্থিব ব্যবস্থাপনা বা সরকার পরিচালনার জন্যও একটি ব্যবস্থাপনা থাকে। এটির প্রয়োজন পড়ে, এছাড়া ব্যবস্থাপনা চলতে পারে না। জাগতিক সরকার পরিচালনায় ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক স্তরে কিছু নিয়ম-নীতি থেকে থাকে।

এগুলো মেনে চলা আবশ্যক হয়ে থাকে। সরকারের নিকট যেহেতু শক্তি থেকে থাকে তাই তারা নিজেদের সেই ব্যবস্থাপনার আনুগত্য নিজের শক্তি ও নিয়ম নীতির অধিনে করে থাকে যা তারা তৈরী করে রাখে। কিন্তু একটি আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হচ্ছে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির আনুগত্য। এ কারণে এখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, প্রত্যেক পদক্ষেপে আনুগত্যকারী আমার প্রিয়। তাই ব্যবস্থাপনার ছোট থেকে ছোট স্তর হতে আরাম্ভ করে ব্যবস্থাপনার উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত যে আনুগত্য রেয়েছে সেটি খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা জামা'তে আহমদীয়ার সাথে খিলাফতের যে ওয়াদা করেছেন আর কুরআন করীমে মু'মিনদের জামা'তের সাথে খিলাফত জারীর যে অঙ্গিকার করা হয়েছে সেটির এক মাত্র উদাহারণ জামা'তে আহমদীয়াতে রয়েছে। কিন্তু এই যে আয়াত, যাতে আল্লাহ তাআলা খিলাফতের ওয়াদা করেছেন আর যাকে আয়াতে ইস্তেখলাফ বলা হয় সে আয়াতের পূর্বের এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এটিও বলেন,

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

আর তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র কসম খায় যে তুমি তাদের আদেশ করলে তারা অবশ্যই (ঘর থেকে) বেরিয়ে পড়বে। তুমি বল, তোমরা কসম খেও না। ন্যায় সঙ্গত ভাবে আনুগত্য কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ সর্বদা অবগত আছেন।

(সূরা আন্ নূর: ৫৪)।

অতএব আল্লাহ্ তাআলা এখানে মুমেনদের আনুগত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মোমেন কিভাবে আনুগত্য করে, কেননা যখন সে শুনে তখন তারা "সামেনা ওয়া আতা'য়না" বলে। এই এলান করে, আমরা শুনলাম আর আমরা আনুগত্য করলাম, আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী হোক বা ইচ্ছার বিরোধী হোক, আনুগত্য করা আমাদের কর্তব্য। এটি হচ্ছে উন্নত পর্যায় যা একজন মোমেনের প্রদর্শন করা উচিত।

আল্লাহ্ তাআলা এটিই বলেন, তোমরা যদি মোমেন হয়ে থাক তা হলে বড় বড় কসম খাওয়ার প্রয়োজন নেই, কেবল ন্যায় সংগত আনুগত্য কর। নিয়ম অনুযায়ী যে আনুগত্য রয়েছে সেটি কর। দাঁড়িয়ে আমরা এ প্রতিজ্ঞা তো করি যে, যে ন্যায় সংগত যে সিদ্ধান্ত দিবেন সেটির মান্য করাকে আবশ্যক মনে করব। কিন্তু যখন সিদ্ধান্ত হয় তখন টাল বাহানা আরম্ভ করে দেই। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা বলেন প্রকৃত মু'মিন সে, যে কেবল কসম খায়না বরং সর্ব অবস্থায় আনুগত্য প্রকাশ করে।

এখানে একটি বিষয় ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি, পূর্বেও বলেছি, এখানে 'আয়াতদার মারুফ' রয়েছে, (ন্যায় সংগতে আনুগত্য)। ন্যায় সংগত সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়ে থাকে, জানা উচিত আহমদীয়া খিলাফতের পক্ষ থেকে কখনো আল্লাহর নির্দেশ পরিপন্থি কোন শিক্ষা দেয়া হয় না। ন্যায় সংগত সিদ্ধান্তের অর্থ এটিই যে, শরীয়ত অনুযায়ী যে কথা হবে সেটির আনুগত্য করা হবে।

প্রত্যেক আহমদী যদি এ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে খিলাফতের ধারাবাহিকতা হচ্ছে, **'খিলাফত আ'লা মিনহাজিন্ নাবুওয়া'** তা হলে এ বিশ্বাসেও প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে, খিলাফত থেকে শরীয়ত পরিপন্থি কোন নির্দেশ আমাদের দেয়া হবে না, তদ্রুপ জামা'তের ব্যবস্থাপনাতেও এটি যখন খিলাফতের ব্যবস্থার অধীনে কাজ করছে তখন সেটি শরীয়তের পরিপন্থি নির্দেশ দিবে না। আর যদি কোন কারণে দেয় বা ভুল বশত এমন কোন নির্দেশ এসে যায় তা হলে যখন যুগের খলীফার নিকট সেই বিষয়টি পৌছবে তখন তিনি সেটিকে ঠিক করে দিবেন।

সুতরাং একজন আহমদী যখন খিলাফতের মজবুতির জন্য দোয়া করে তখন সাথেই নিজের আনুগত্যের উন্নত পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠাকারী হওয়ার জন্যও দোয়া করা প্রয়োজন যেন আল্লাহ তাআলার পছন্দনিয় আর খিলাফতের পুরষ্কারের সাথে চিমটে থাকতে পারে। যে হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছি খোদা তাআলা যেন কখনো সেটি থেকে বঞ্চিত না করেন।

কদাচিত কতক মানুষ নিজের ব্যক্তি স্বার্থের কারণে জামাতের ব্যবস্থাপনাতে মন্দ ধারণা পোষণ করে থাকে আর সেই পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় যা আল্লাহতাআলা এখন চৌদ্দ শত বছর পর দান করেছেন। উদাহররণ স্বরূপ কতক কানুনী বাধ্যবাধকতার কারণে যদি 'কাযার' ব্যবস্থাপনায় যা বাস্তবে জামাতের ভিতর মধ্যস্ততাকারী ব্যবস্থাপনা, যখন লিখিত চাওয়া হয় আর নতুন করে লিখিয়ে নেয়া হয় এ সালিশী এবং বিচারিক সিদ্ধান্তকে আমি সানন্দ মানতে রাজী আছি আর কোন আপত্তি থাকবে না।

এ ব্যবস্থাপনায় আমি স্ব-ইচ্ছায় নিজের বিষয়াদী নিয়ে এসেছি। তখন কতক এই কুধারণা করে যে, আমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের বিরুদ্ধে যাবে এ জন্য আমরা লিখিত দিব না, অস্বীকার করে বসে। এমন লোকদের শুরু থেকেই নিয়্যত পবিত্র থাকে না, তারা কেবল বিষয়টিকে দীর্ঘায়ীত করতে চায়, (তার মনে করে) কোন বিষয়কে কিছু দিন এড়িয়ে চললে পরে এখানে সিদ্ধান্ত হবে না আর তখন সরকারের আদালতে নিয়ে যাব। অত:পর এ সকল লোকেরা যখন এখান থেকে অস্বীকার করে জাগতিক আদালতে যায় আর সেখানে যখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত হয় তখন পূণরায় 'কাযায়' নিয়ে আসার চেষ্টা করে।

এমন লোকদের বিষয় গুলো জামাত পূণরায় গ্রহণ করে না, কেননা প্রথমবার তারা আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেছে, তারা জামা'তের ব্যবস্থাপনায় ভরসা করেনি। ফল স্পষ্ট, আল্লাহ্ তাআলাও এটিই বলেন যে, তারা আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেছে, অত:পর তারা আমার অপছন্দনিয়। মানুষ যখন আল্লাহ্ তাআলার অপছন্দনিয় হয়ে যায়, বাহ্যত: সে জামা'তের সদস্য আখ্যায়িত হলেও বাস্তবে সে জামাতের সেই কল্যাণ থেকে কল্যাণ মন্ডিত হয় না যা খোদা তাআলা জামা'তের সদস্যদের জামা'তের কল্যাণে পৌছিয়ে থাকেন।

সুতরাং বাহ্যত: ছোট ছোট বিষয় কিন্তু আত্মঅহমিকা এবং কু-ধারণার জন্য আল্লাহ তাআলার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়। তাই প্রত্যেক আহমদীর খোদা তাআলার প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, এতেই আমাদের আর আমাদের বংশধরদের জীবন নিহীত।

এরই সাথে আমি জামা'তের কর্মকতাদেরও এটি বলব যে, তারা তখনই খিলাফতের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারী আখ্যায়িত হতে পারেন যখন খোদার ভয়ে সুবিচারের চাহিদা সমূহ পূর্ণকারী হন। কোনও কর্মকর্তার কারণে কেউ পদস্খলিত হলে সেই কর্মকর্তাও সেটির জন্য দোষী। কেননা সে খোদা তাআলার দেয়া আমানতের হক আদায় করেনি।

তার ভুলের জন্য যদি পদস্খলন হয় আর কোথাও ইচ্ছাকৃত ভাবে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তবে অবশ্যই সেই (কর্মকর্তা) দোষী আর আমানতের হক আদায় কারী নয়। সুতরাং প্রত্যেক আহমদী সে যেখানেই থাকুক, সব সময় এটি বুঝা উচিত যে, আমি আমার বয়আতের অঙ্গিকারকে কায়েম রাখার জন্য, নিজের ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য প্রত্যেক অবস্থায় সততা এবং তাকওয়ার বহি:প্রকাশ করতে থাকব, যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য পূর্ণ কারী হতে পারি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "আমি জামা'তের আধিক্যে কখনও আনন্দিত নই" (জামা'তে সংখ্যার আধিক্য যেটি রয়েছে সেটি আনন্দের বিষয় নয়) "জামা'তের প্রকৃত অর্থ এটি নয় যে, হাতে হাত রেখে বয়আত করে নিলাম বরং জামাত তখন জামা'ত আখ্যা পাওয়ার যোগ্য হতে পারে যখন বয়আতের প্রকৃত উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যিকার অর্থে তাদের মাঝে একটি পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে যাবে আর তাদের জীবন পাপ এবং পঙ্কিলতা থেকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আত্মিক কামনা বাসনা আর শয়তানের কব্জা থেকে বেরিয়ে খোদা তাআলার সন্তুষ্টিতে বিলীন হয়ে যাবে। আল্লাহ্ এবং বান্দার হক খোলা হৃদয়ে পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করবে। ধর্মের জন্য আর ধর্ম প্রচারের জন্য তাদের মাঝে একটি ব্যাকুলতা সৃষ্টি হবে। নিজের আশা আকাঙ্খা মিটিয়ে খোদার হয়ে যাবে।"

তিনি (আ.) বলেন, "মুত্তাকি সে-ই, যে খোদা তাআলাকে ভয় করে আর সেই বিষয় গুলোকে ছেড়ে দেয় যা ঐশী ইচ্ছার পরিপন্থি। আত্মা এবং আত্মার আশা আকাঙ্খা আর পার্থিব জগতের মাঝে যা আছে সবকিছুকে আল্লাহ্ তাআলার তুলনায় মূল্যহীন জ্ঞান করবে।" (মলফুযাত ৫ম খন্ড, পৃষ্টা-৪৫৪-৪৫৫, নতুন সংস্করণ)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আকাঙ্খা অনুযায়ী জীবন কাটানোর তৌফিক দান করুন।

অনুবাদ : **মওলানা বশিরুর রহমান**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।


**বের হয়েছে! বের হয়েছে !!**

১। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কর্তৃক রচিত অত্যন্ত মূল্যবান বই 'দাফেউল বালা' (বালা মুসিবত প্রতিরোধক) বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে।

২। আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব রচিত 'কৃষ্ণের বিশ্বরূপ ও কল্কি জগতপতি' বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

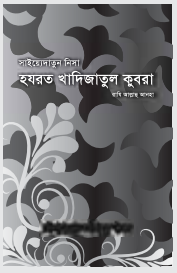


৩। মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেব রচিত 'সাইয়্যেদাতুন নিসা হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)' বইটি সদ্য প্রকাশিত হয়েছে।

সবকটি বই আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনি আপনার কপিটি দ্রুত সংগ্রহ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা :
আহমদীয়া লাইব্রেরী
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল নং : ০১৯১২৭২৪৭৬৯

# হযরত তালুত (আ.)-এর ধর্ম প্রচার

সংকলন : মৌ. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন

বনী ইসরাঈলী নবী হযরত মূসা (আ.) তাঁর জাতির নিকট এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ্ নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, সে কি করে আমাদের উপর হুকুমত লাভ করতে পারে অথচ তার চাইতে আমরা হুকুমতের বেশী হকদার এবং তাকে এমন কিছু আর্থিক প্রাচুর্যও দেওয়া হয়নি? তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁকে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে এবং দৈহিক বলে অধিক সমৃদ্ধ করেছেন।"

বস্তুত আল্লাহ্ যাকে চান তাঁকে শাসন ক্ষমতা দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা, সর্বজ্ঞানী। এই ভবিষ্যদ্বাণী দুইশত বৎসর পর পূর্ণতা লাভ করেছে। হযরত তালুত (আ.) বনী ইসরাঈল জাতির একজন বাদশাহ্ যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর দুইশত বৎসর পর এবং হযরত দাউদ (আ.)-এর দুইশত বৎসর পূর্বে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ১২৫০ খৃষ্টপূর্বে ছিলেন এবং সাহসী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

যখন বনী ইসরাঈলীরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল, তাদের কোন বাদশাহ্ ছিল না এবং তাদের সেনাবাহিনীও ছিল না। তাদের দলাদলি ও বিশৃঙ্খলার কারণে, আল্লাহ্ শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে মিদিয়ানদের হাতে সমর্পন করলেন। মিদিয়ানরা সাত সৎসর ধরে তাদের উপর লুণ্ঠন-নির্যাতন চালাল এবং তারা পর্বত গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। এই অসহায় অবস্থায় তারা আল্লাহ্‌র কাছে ক্রন্দন করতে লাগল এবং তিনি তাদের মধ্যে এক নবীর আবির্ভাব ঘটালেন।

হযরত তালুত (আ.)-এর কাছে আল্লাহ্‌র এক ফিরিশ্‌তা এসে তাকে বাদশাহ্ নিযুক্ত করে স্বর্গীয় সাহায্যের আশ্বাসবাণী প্রদান করলেন। হযরত তালুত (আ.) আল্লাহ্‌কে বললেন, "হে আমার প্রভু! কীভাবে কি দিয়ে আমি বনী ইসরাঈল জাতিকে বাঁচাবো? তুমি তো জান, আমি মানা সের এক গরীব পরিবারের লোক এবং আমার পিতার সন্তানদের আমি নগণ্য। ভবিষ্যদ্বাণীতে তাও উল্লেখ ছিল যে, নিশ্চয় তার শাসন ক্ষমতার নিদর্শন এই যে তোমাদের নিকট এক 'তাবুত' আসবে যার মধ্যে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে মানব প্রশান্তি থাকবে এবং মূসার বংশধরগণ এবং হারুনের বংশধরগণ যা ছেড়ে গিয়েছে তা উত্তম অবশিষ্টাংশ থাকবে, ফিরিশ্‌তাগণ তা বহন করবে। তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তা হলে এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে।'

'তাবুত' আসবে, এর অর্থ এই যে, যা আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছিলেন, তা ছিল বীরত্ব ভরা, অধ্যবসায়ী হৃদয় যার সাথে প্রশান্তি মিলিত হয়ে তাদেরকে এমন শক্তিশালী করে তুলল যে, তারা অকাতরে শুক্রর মোকাবেলা করে তাদেরকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হল। অন্য একটি অনুগ্রহ যা আল্লাহ্ বণী ইসরাঈলদের প্রতি করেছিলেন, তা এই বংশধরগণ যা ছেড়ে দিয়েছে' তাহল, হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-এর বংশের গুণাবলী বিকশিত হয়েছিল, সেই মহাগুণগুলোও আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করে দিলেন।

হযরত মূসা (আ.) ও হারুন (আ.) বংশের ও উত্তরাধিকাররূপে কোন জাতির ধন-সম্পদ রেখে যান নি, তারা নিজেদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে মন-মস্তিষ্কের উচ্চ নৈতিক গুণাবলীর উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছিলেন যা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বনী ইসরাঈলীরা পরে প্রাপ্ত হয়েছিল।

বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্‌র পরীক্ষা ঃ যখন তালুত (আ.) সৈন্য বাহিনীসহ বের হলেন তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে এক নদীর দ্বারা পরীক্ষা করবেন।

অতএব, যে কেহ তা হতে পানি পান করবে সে আমার মধ্য হতে নয় এবং যে কেহ তার স্বাদ গ্রহণ করবে না, নিশ্চয় সে আমার মধ্য হতে হবে, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তার হস্ত দ্বারা এক আঙ্গুলী পান করবে সে-ও আমারই মধ্য হতে হবে, তাদের মধ্য হতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত বাকী সকলেই তা হতে পান করল এবং যখন তিনি স্বয়ং এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদের সংখ্যা ছিল ৩০০ মাত্র। তারা নদী অতিক্রম করল, তখন তারা বলল, আমাদের মধ্যে জালুত বিশৃঙ্খল ব্যক্তি বা জাতি তারা অপরকে আক্রমণ ও অপমান করে বেড়ায়। তারা মিদিয়ানী শিরোনামের নিম্নে তালুত এবং তার সৈন্য বাহিনী বসবাস করিত। এই মিদিয়ানীরা বনী ইসরাঈলকে কষ্ট দিয়েছে, লুণ্ঠন করেছে এবং বহু বৎসর যাবত তাদের জায়গা-জমি ও বাড়ী ঘর ধ্বংস করেছে।

আমালেকীরা এবং অন্যান্য প্রাচ্য গোত্রগুলি মিদিয়ানদেরকে এই লুণ্ঠন কার্যে সাহায্য করত। তাদের সৈন্যবাহিনীর সাথে মোকাবেলা করবার আদৌ ক্ষমতা নাই। কিন্তু যারা বিশ্বাস রাখত যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে, তারা বলল, কত ছোট দল আল্লাহ্‌র হুকুমে বড় বড় দলের উপর জয়যুক্ত হয়েছে এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সাথে আছেন। যখন তারা জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করবার জন্য বের হল, তখন তারা বলল, "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাও ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরিন।"

'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ধৈর্য শক্তিদান কর এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সহায়তা কর।' অতঃপর আল্লাহ্‌র হুকুমে তারা এদেরকে পরাস্ত করল, কিন্তু জালুতকে এবং মিদিয়ান জাতিকে সমূলে উৎখাত করতে সময় লেগেছিল প্রায় ২০০ বৎসর। তালুত (আ.)-এর হাতে পরাজয়ের সূচনা হয়েছিল। আর এর দুইশত বৎসর পর হযরত দাউদ (আ.)-এর হাতে মিদিয়ান জাতি এমন চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করে যে, এরপর তারা আর মাথা তুলতে পারেনি।

হযরত দাউদ (আ.) জালুতকে হত্যা করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে হুকুমত ও হিকমত দান করলেন এবং আল্লাহ্ যদি মানবজাতিকে অর্থাৎ তাদের একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে পৃথিবী ফাসাদপূর্ণ হয়ে যেত। অন্যায় ও বিশৃংখলাকে দমন করা এবং শান্তিকে সমুন্নত রাখার জন্যই যুদ্ধ। বিশৃংখলা সৃষ্টি, শান্তি-ভঙ্গ ও দুর্বল জাতির স্বাধীনতা হরণের জন্য যুদ্ধ নয়।

(তথ্য : আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা কুরআন মজীদ অবলম্বনে)

# যরাথুস্ত্র ও তার ধর্ম

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

মানব জাতির ইতিহাস বিশ্বে ভাল ও মন্দ শক্তির মধ্যে দ্বন্দের এক স্থায়ী ও অবিরত সংগ্রামের কাহিনী উন্মোচন করে। বিভিন্ন সময়ে মানুষ সাধারণভাবে নৈতিক স্খলন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রবাহে নিপতিত হয়ে পড়ে। ক্ষমতার রাজনীতির আড়ালে ক্ষতিকর লোকদের মন্দ পরিকল্পনাসমূহ চতুর্দিকে এক সুদূর-প্রসারি অশান্তি, সামাজিক নিয়ম-নীতির অনুপস্থিতি এবং অশান্তিপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা করে।

এমন এক পারিপার্শ্বিক অবস্থায়, কেবলমাত্র একজন সদ্‌গুণ বিশিষ্ট ও স্বর্গীয় আধ্যাত্মিক আচরণ সম্পন্ন লোকই বিশ্বের চলমান ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষকে উদ্ধার ও রেহাই দিতে এগিয়ে আসতে পারেন, যিনি ত্রাণকর্তা সংস্কারক, সতর্ককারী, দূত অথবা নবী হিসেবে সমধিক পরিচিত, যিনি মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করার দায়িত্ব খোদার কাছ থেকে পেয়ে থাকেন। তিনি তাদেরকে সৎকর্ম করতে, অসৎ ও পাপপুর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকতে এবং একমাত্র পবিত্র ও মহান খোদার ইবাদত করতে নসিহত করেন।

**এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা নিম্নরূপ:–**

'এবং আমরা প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে মানুষকে উপদেশ দিতেন' (১৬ : ৩৭)

পাশ্চাত্যের লেখক থমাস কার্লাইলের ধারণা-সমূহের অংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি বলেন, "অতিব মূল্যবান উপহার, যা স্বর্গ এ মর্তকে দিতে পারে; যাকে আমরা 'প্রতিভাশীল' ব্যক্তি বলতে পারি; মানবের সেই আত্মা, যা আকাশ থেকে খোদার বাণীসহ আমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়ে থাকে, এটাকে আমরা এক অলস কৃত্রিম আতশবাজির মত, আমাদেরকে যৎসামান্য আমোদ দানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে ভেবে অপচয় করে ফেলি, এবং ছাই-এ, ধ্বংসাবশেষ, নিষ্ফলতায় ডুবিয়ে দিই; এক মহাপুরুষকে এমন অভ্যর্থনা দেই যে, এমনকি তাঁকে নিখুঁতও আখ্যায়িত করিনা"।

প্রাচীনকালে মহান খোদা কর্তৃক 'প্রতিভাধরদের' একজনকে ধরাপৃষ্ঠে প্রেরণ করা হয়, যিনি ছিলেন যরাথুস্ত্র (গ্রীক নাম হচ্ছে যরোয়াষ্টার), পার্শী ধর্ম 'যরাথুস্ত্রবাদ' এর প্রতিষ্ঠাতা।

যরাথুস্ত্র ও তার ধর্মকে পূর্ব-ইউরোপে জ্ঞানের প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যরাথুস্ত্রবাদই হচ্ছে বিশ্বে নাযেলকৃত সবচে' পুরোনো ধর্ম। উপরন্তু, এজমালী ভাবে যরাথুস্ত্র পারস্যের (বর্তমান ইরান), যেটা মধ্যপ্রাচ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং 'প্রাচীন সভ্যতার দোলনা' নামে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, সেটার 'জাতীয় নবী' হিসেবে পরিচিত।

যরাথুস্ত্রবাদ, (এর আরেকটি নাম হচ্ছে মাসদেসনিবাদ এবং ভারত ও পাকিস্তানে পার্শীবাদ) যদিও ইরানের ইসলাম পূর্ব ধর্ম, তথাপি এটা সেখানকার মাত্র কয়েকটি পৃথক এলাকার সংখ্যালঘুদের মধ্যে টিকে আছে এবং বৃহত্তর জনসংখ্যা থেকে স্বতন্ত্র রয়েছে।

যরাথুস্ত্রবাদীরা এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিল এবং কয়েক শতাব্দী ধরে পর্যায়ক্রমে একামেনিয়ানস, পার্থিয়ানস ও সাশানিয়ানস নামক তিনটি শক্তিশালী পার্শী রাজত্বের ছত্রছায়ায় তাদের সভ্যতা উন্নতি লাভ করে থাকলেও বর্তমানে পৃথিবীতে তাদের জনসংখ্যা ১৪০,০০০ এর কাছাকাছি এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ-সংখ্যক সদস্য, যাদের সংখ্যা প্রায় ৮২,০০০, বোম্বে (ভারত)তে এবং প্রায় ৩০০০ জন করাচি (পাকিস্তানে)তে বসতি স্থাপন করেছে এবং খুবই উন্নতি করেছে।

বর্ধিত সংখ্যায় সম্প্রদায়ের বাইরে বিয়ে শাদী করা এবং জন্ম হার কমে যাবার কারণেও তাদের জগদ্ব্যাপী শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় পেতে দেখা যায়। উপরন্তু, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের স্ব-ধর্ম ত্যাগ করে যরাথুস্ত্রবাদে প্রবেশের অনুমতি না থাকার কারণেও এমনটি ঘটেছে।

যরাথুস্ত্রের জীবন. শিক্ষা ও ধর্মের বর্ণনা দেবার আগে সমসাময়িক লোকদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, অঞ্চল এবং পরিবেশ, যার মধ্যে ধর্মটি প্রকাশ ও উন্নতি লাভ করেছে, তা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

**ঐতিহাসিক পটভূমি :**

**পারসিকদের ঐতিহাসিক উৎস ও বিকাশ, অথবা সে ব্যাপারে** যরাথুস্ত্রবাদ সম্পর্কিত প্রশ্নটির সমাধান অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এ ধর্মের কাহিনী খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের কোন এক সময়ে ইন্দো-ইউরোপীয়দেরকে নিয়ে শুরু হয়েছিল। এটা ছিল খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৩০০০ সালে, যখন পূর্ব ইউরোপের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী গোত্র সমূহের একটি দল মতভেদ করতে শুরু করে। কতক দক্ষিণ দিকে হিজরত করে গ্রীস ও রোমে বসতি স্থাপন করে, অন্যরা উত্তর দিকে হিজরত করে।

স্ক্যান্ডিনোভিয়ায় বসতি স্থাপন করা সত্বেও অন্যরা খৃষ্টপূর্ব ২০০০ সন নাগাদ কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব তীরে তাদের পশুপাল চড়াতে থাকে। সেখানে কিছু কালের জন্য তারা গৃহ নির্মাণ করে নিজেদেরকে 'আর্য' উপাধিতে ভূষিত করে, যার অর্থ হচ্ছে 'সম্ভ্রান্ত'; কিন্তু পন্ডিতগণ তাদেরকে 'ইন্দো-ইরানিয়ান' বলে ডাকে। খৃষ্টপূর্ব প্রায় ১৮০০ সনের দিকে তারা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে দু'দফায় পূর্বদিকে সফর করে। প্রথম দলটি উত্তর পারস্যের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেখানে কতিপয় বসতিস্থাপনকারীকে রেখে মূল দলকে নিয়ে পশ্চিম ভারতে চলে যায়, আর দ্বিতীয় দলটি পারস্যে স্থায়ী বসতি গেড়ে বসে।

খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ সনের অব্যবহিত পরে স্থানীয় অধিবাসী ও পার্সীদেরকে নিয়ে গঠিত আর্যদের দু'টি দল, যারা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারীদের সহ কয়েক শতাব্দী ধরে ইরান দখল ও সেখানে বসবাস করে আসছিল। স্থানীয় অধিবাসীরাই ছিল প্রথম আর্য, যারা পশ্চিম এশিয়ায় তাদের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে তারা সর্ববৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়।

স্থায়ী অধিবাসীদের শাসনকালে ধর্মীয় পারিপার্শ্বিকতা এমন ছিল যে, যাজকদের যে দলটি ধর্মীয় বিবর্তনের গতিপথ ও সূচীর উপর প্রভাব প্রয়োগ করেছিল, তারা ছিল ম্যাগী। রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবে তারা ছিল খুবই শক্তিধর। তারা ছিল অতি মাত্রায় শাস্ত্রীয় আচারনিষ্ঠ। তারা দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদান করতো, স্বপ্নের তাবির করতো, মন্দ বিতাড়ণে জাদুবাক্য আবৃত্তি করতো, বিরক্তিকর সৃষ্টি

সমূহ নিধন করত এবং অনেক ধরনের পেশার অনুসরণ করত। তারা আকামেনিয়ানদের কাছে কোন অনুগ্রহ লাভ করেনি এবং দারিউসের রাজত্বকালে সম্পূর্ণভাবে হীনপদস্ত হয়। বুদ্ধিমান হয়েও তারা যরাথুস্ত্রবাদ গ্রহণ করতে পছন্দ করে এবং শাসক শ্রেণীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। দারিউসের পরবর্তী কালে তারা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পৌরহিত্যে প্রবেশের ব্যবস্থা করে এবং পুণরায় তাদের সামাজিক সম্মান অর্জন করে।

পার্শীগণ তাদের অতীত ইতিহাস খুঁজতে একামেনেস নামক পূর্বপুরুষের সন্ধান করে থাকে। কিন্তু তিনি হলেন দ্বিতীয় সাইরাস একামেনেসের ৫ম বংশধর, এবং 'ফারস' এর যুবরাজ, (গ্রীক শব্দ 'পেরিস', যেখান থেকে 'পার্সি' ও 'পার্সীয়ান' শব্দের উৎপত্তি) যিনি খৃষ্টপূর্ব ৫৫০ অব্দে স্থানীয় অধিবাসীদেরকে পরাস্ত করেন এবং একামেনী রাজ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন (খৃষ্টপূর্ব ৫৫০-৫৩০ অব্দ)। তিনি ভারতের সীমানা সমূহ থেকে গ্রীস পর্যন্ত সম্পূর্ণ এশীয় অঞ্চল দখল করে নেন।

মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক) সহ ভারত থেকে সিরিয়া পর্যন্ত তার রাজত্ব বিস্তার লাভ করে। নূতন নীতি প্রবর্তনের ধারায় ভিন্ন কৃষ্টি, পৃথক ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আলাদা ভাষাভাষি হওয়া সত্বেও তিনি তার বৃহৎ রাষ্ট্রের সব মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলো মেনে নেন, স্থানীয় রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন এবং তার অধিকৃত এলাকার সব মানুষের ঈশ্বরদেরকে সম্মান করেন।

পবিত্র কুরআন (সূরা আল-কাহ্‌ফ, ৮৪-৯৯) জুলকারনাইনকে খোদার একজন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করে ঐশী বার্তা দ্বারা মহিমান্বিত করেছে। তাঁকে বিজয়ী, রাজা, ন্যায়-পরায়ণ শাসক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বলা হয় যে, পরাভূত জাতিসমূহের সাথে তিনি সদাশয় আচরণ করতেন এবং সবশেষে তাঁর সম্পর্কে এটাও উল্লেখ করা হয় যে, তিনি এক মাঝপথ এলাকায় পৌঁছুলেন,

যেখানকার বর্বর লোকজন ও ইয়াজুজ এবং মা'জুজ অনধিকার হস্তক্ষেপ করেছিল। জুলকারনাইন সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের সব বিবরণ পবিত্র বাইবেল সমর্থন করে এবং ওগুলো রাজা সাইরাসের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। অতএব, পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত জুলকারনাইন দ্বিতীয় সাইরাস ব্যতিত অন্য কেউ নয়।

দ্বিতীয় সাইরাসের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় ক্যাম্বিসেস (খৃষ্টপূর্ব ৫২৯-৫২২ অব্দে) এবং পরবর্তী বংশধরগণ দারিউস (খৃষ্টপূর্ব ৫২২-৫৮৬ অব্দ, জর্জিস (খৃষ্টপূর্ব ৪৮৬-৪৬৫ অব্দ) এবং আর্টাজর্জেস খৃষ্টপূর্ব ৪৬৫-৪২৫ অব্দ) তার সামরিক অভিযানসমূহ জারি রাখেন। যাহোক, প্রথম আর্টাজর্জেসের রাজত্বকাল ৪০ বছর স্থায়ী হলেও মিশর এবং অন্যান্য প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং গ্রীক রাজ্যগুলোর সাথে এক দীর্ঘ সময় ধরে অবিরাম যুদ্ধ চলতে থাকে।

পরিণতিতে একামেনীয় রাজত্বে অভ্যন্তরীণ পতনের সূচনা হয়। কেবলমাত্র তৃতীয় আর্টাজর্জেসের শাসনামলেই (খৃষ্টপূর্ব ৩৫৯-৩৩৮ অব্দ) সাম্রাজ্যটির সীমানা সমূহ পুন:স্থাপন করতে হয়েছিল কিন্তু সেটাও এক অল্প সময় স্থায়ী হয়। তৃতীয় দারিউসের শাসনামলে (খৃষ্টপূর্ব ৩৩৬-৩৩১ অব্দ) তাইগ্রীস নদীর পূর্ব পার্শ্বের আরবেলা সমভূমির কাছে এক চূড়ান্ত যুদ্ধে আলেকজান্ডারের হাতে রাজ্যটির পতন ঘটে। তৃতীয় দারিউস পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং নিহত হয়, আর তার সৈন্যরা মহামতি আলেকজান্ডারকে এশিয়ার রাজা হিসেবে রেখে পূর্বদিকে পালিয়ে যায়।

এসব ঘটনার কিছু সময় পূর্বে যরাথুস্ত্রের আবির্ভাবের কথা বর্ণিত আছে। তিনি কোথায় এবং কখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদ সমূহে আলোচনা করবো।

যরাথুস্ত্র (আ.) ছিলেন প্রাচীন পার্সী ধর্ম যরাথুস্ত্রবাদের প্রবর্তক, যা পশ্চিমা বিশ্বে তার নামানুসারেই পরিচিত। প্রাচীন রোমের ভাষা যরোয়াস্ত্রেস থেকেই এর উৎপত্তি এবং যেটাকে গ্রীক ভাষা 'যরাস্ত্রেস'-এর ছাঁচ দেয়া হয়েছে। এ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ আভেস্তা সঙ্গত ভাবেই তাঁকে যরাথুস্ত্র বলে উল্লেখ করে, যখন পাহ্‌লভি বর্ণনায় নামটি হচ্ছে যরাথুস্ত, এবং আধুনিক পার্সীতে তাকে যারদুস্ত, যারতুস্ত, বা যারাথুস্ত বলা হয়েছে।

## জন্ম তারিখ

তার সঠিক জন্ম-তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এরিষ্টটল, হারমোডোরাস এবং জানখাসদের (খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম অব্দ) মত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের উদ্ধৃতি দিয়ে বড় বড় গ্রীক লেখক, এবং প্লুটার্চ তার জন্মকাল খৃষ্টপূর্ব ৬০০০ অব্দের আগে বলে উল্লেখ করেন। ইউডোক্সাস (খৃপূর্ব ৩৬৫ অব্দ) এটাকে প্লেটোর (খৃষ্ট পূর্ব ৩৪৭ অব্দ) মৃত্যুর প্রায় ৬০০০ বছর পুর্বের বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ তার জন্মকালকে খৃষ্টপূর্ব ১৭৫০ এবং ১০০০ এর মধ্যবর্তী সময়ে রেখেছেন, বিশেষ করে পারস্য যখন প্রস্তর যুগ থেকে উত্থিত হচ্ছিল। আল বিরুনী (৯৭৩-১০৪৮) খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দকে যরাথুস্ত্রের প্রকাশের সঠিক সন বলে লিখেছেন, তবে এটা তার জন্মতারিখ, নাকি জন্মের পর দৃশ্যপটে উপস্থিত হবার তারিখ, সে বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

যরাথুস্ত্রীয় ঐতিহ্য মোতাবেক তিনি আলেকজান্ডারের ২৫৮ বছর পূর্বে উন্নতি লাভ করেছিলেন, যেটা তার খৃষ্টপূর্ব ৫৮৮ অব্দে আগমনের পর খৃষ্টপূর্ব ৩৩০ অব্দে একামেনীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী পার্সেপলিস জয়ের দিকে ইঙ্গিত করে। যরাথুস্ত্রের বয়স চল্লিশ বছরের সময় কোরাস্মিয়ার রাজা ভিস্তাস্পা (গ্রীক হিস্তাস্পেস) ধর্মান্তরিত হন এবং এক বর্ণনা মতে পূর্বোক্ত-জন সত্তর বছর জীবিত ছিলেন। ঐতিহ্যগত ভাবে এটাও বিশ্বাস করা হয় যে, গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস তার সাথে অধ্যয়ন করেছেন। এভাবে তার জন্ম তারিখ খৃষ্টপূর্ব ৬২৮-৫৫১ অব্দের মাঝামাঝি সময়কে ধরে নেয়া হয়, যদিও ঐতিহ্যগত এই বিশ্বাস আধুনিক কালের পন্ডিতগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

## জন্মস্থান

এটাও এক বিতর্ক-মূলক বিষয়। কেউ তাকে বলে প্রাক্তন ইরানী; অন্যরা তাকে রাজেস, আধুনিকরা তাকে তেহরানের শহরতলির অধিবাসী বলে বর্ণনা করে থাকে। একজন ইরানী পন্ডিত বর্ণনা করেন যে, আভেস্তার মতানুসারে তার জন্মস্থান হচ্ছে দারিয়ান নদীর তীরবর্তী এলাকা এরিয়ানা ভায়েজায়। দারিয়া বর্তমানে ট্রান্‌স্‌ওক্সিয়ানায় আরাজেস (পার্সীতে সেহুন) নামে পরিচিত। ইসলামী গ্রন্থকার শাহরাস্তানি (১০৮৬-১১৫৩) এবং আত্‌তাবরি (৮৩৯-৯২৩) একে পশ্চিম ইরানে অবস্থিত বলে বর্ণনা করেন। আরব লেখক ইব্‌ন হার্দাদবাহ (৮১৬) এবং ইয়াকুত (১২২০) উল্লেখ করেন, আজারবাইজানের শিজ জেলার উর্মিয়া হচ্ছে (বর্তমানে বিজাজেহ বলে খ্যাত) তাঁর জন্মস্থান।

তার জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদির অভাবকে বিবেচনায় এনে এ সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, যরাথুস্ত্র খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষে অথবা ষষ্ট শতাব্দীর শুরুতে দ্বিতীয় সাইরাসের (খৃষ্টপূর্ব ৫৫০-৩৩০ অব্দ) অধীনে পারস্য-সাম্রাজ্য গঠনের আগে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। যরাথুস্ত্র ছিলেন প্রথম ভাগের ইন্দো-ইরানীদের বংশধর। তাঁর লোকেরাই প্রথম স্থায়ী কৃষক ছিলেন।

তাঁর পিতার নাম ছিল পৌরুসাস্পা, যিনি নাইটদের এক বিনয়ী-পরিবার স্পিতামার সদস্য, যার বংশ-বৃত্তান্তে পঁয়তাল্লিশতম পূর্বপুরুষ (আদমের মত) ছিলেন গায়োমার্ত। তার মা ছিলেন দুগ্ধোভা, যিনি ছিলেন 'ভোগা' বংশীয়। যরাথুস্ত্রের শৈশব ও পরবর্তী-জীবন অলৌকিক ভাবেই সমৃদ্ধশালী বলে কথিত আছে। বর্ণিত আছে যে, জন্মের সময় তিনি কাঁদার বদলে হাসছিলেন।

উল্লেখ করা হয় যে, শিশুকালে অনেকবার তাঁর জীবনের উপর পশুদের হস্তক্ষেপ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। একবার একটি ষাঁড় তার উপর দাঁড়িয়ে গিয়ে তাঁকে গবাদি পশুর খুরের আঘাত থেকে বাঁচায়। আস্তাবলের এক ঘোড়া তাঁকে ঘোড়াদ্বারা পদদলিত হওয়া থেকে বাঁচায়। আরেকবার এক নেকড়ে-বাঘী তাঁকে খেয়ে না ফেলে বরং ওর ছানাদের সাথে তাঁকেও মেনে নেয়। (যদিও তার কতিপয় আধুনিক অনুসারীরা এসব ঘটনা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে না।)

বর্ণিত আছে যে, যরাথুস্ত্র তিনটি বিয়ে করেন (তাঁর বহু বিবাহের রীতি তাঁর অনুসারীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত)। প্রথম স্ত্রীর দিক থেকে তার তিন কন্যা ও এক পুত্র, দ্বিতীয় স্ত্রী থেকে দুই পুত্র এবং তৃতীয় স্ত্রীর কোন সন্তান ছিল না।

ঘটনা পরাম্পরা একথাও সমর্থন করে যে যরাথুস্ত্রকে ধর্ম-যাজক হবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। 'গাথা'তে তিনি নিজেকে 'জাওতার' বলে উল্লেখ করেন, যার অর্থ হচ্ছে 'পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন যাজক'। ইন্দো-ইরানীদের মতে, প্রশিক্ষণটি শুরু হয় সাত বছর বয়সে এবং পরিচালিত হয় মৌখিকভাবে, কারণ সে সময় তাদের লেখার বিষয়ে কোন জ্ঞান ছিল না।

সম্ভবত: পনের বছর বয়সে তাকে একজন যাজক বানানো হয়, যে বয়সে উপনীত হলে ইরানীরা মনে করতো যে, পরিপক্কতা এসে গেছে। তাঁর সময়ের বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে তিনি সৃষ্টির রহস্য ও জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে যতোখানি পেরেছিলেন, শিখে নিয়েছিলেন। যাহোক, তাঁর কৌতুহলী মন তৃপ্ত হয়নি এবং তাঁর স্বর্গীয় বুদ্ধিমত্তা তাঁকে ধ্যান ও আত্ম-পরীক্ষার দিকে পরিচালিত করেছিল। তিনি আত্ম উপলব্ধি ও সৃষ্টির মধ্যে মানব-জাতির ভূমিকা বুঝার দিকে মনোনিবেশ করেন।

বিশ বছর বয়সে পিতা-মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি গৃহ ত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, তিনি পর্বতাভিমুখে গমন করেন; অনেক নেক আত্মা, বিবেকবান এবং পবিত্র প্রেমী লোকদের সাথে পরামর্শ করেন। তার স্তবগানগুলো এ ইঙ্গিত দেয় যে, ভ্রমণকালে তিনি অবশ্যই হিংস্রতার আচরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ক্ষমতাহীন হওয়ার বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। সবল, দুর্বল, নির্বিশেষে সবার জন্যে তাঁর ছিল ন্যায় বিচার ও নৈতিক বিধির সফলতার এক গভীর আকাঙ্খা, যাতে সবাই প্রকৃত সুখ ও শান্তিতে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।

**সত্যানুসন্ধানের এই তীব্র বাসনা ও উদ্বেগ-কালে এক ভোরে তিনি সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে এরূপ বললেন :**

'তুমি মহান তারকা! যাদের জন্যে তুমি আলো দাও, তাদেরকে ছাড়া তোমার শান্তি কোথায়!

দশ বছর ধরে তুমি আমার এ গুহায় আলো দান করছো :

এ আলো-দানে তোমার তো ক্লান্ত হবার কথা, যদি তোমার আলো ও এ-পথ আমার, আমার ঈগলের ও আমার সর্পের জন্যে বরাদ্দ না থাকতো।

কিন্তু আমরা প্রত্যেক সকালে তোমার প্রতীক্ষা করেছি এবং তোমার প্রাচুর্য থেকে গ্রহণ করে তা দ্বারা তোমাকে মহিমান্বিত করেছি।

দেখ! জ্ঞানাহরনে আমি সেরূপ ক্লান্ত যেমনটি অত্যধিক মধু আহরণে মৌমাছি ক্লান্ত; সেটা পেতে আমার হাতকে প্রসারিত করতে হয়।

দান ও বিতরণ করতে আমি ব্যগ্র, যতক্ষন না বিজ্ঞ জনেরা তাদের বোকামীতে, আর গরীবরা তাদের ধনে আবারও আনন্দিত হয়েছে।

সে লক্ষ্যে আমি গভীরে অবতরণ করি, যেভাবে নিশীথে তুমি করে থাকো, যখন তুমি সমুদ্রের আড়ালে ডুবে যাও, আর পাতালকে আলোকিত করো, তুমি সত্যিই এক দানশীল তারকা!

আমিও তোমার মত নীচে যাবো আর যাদের কাছে আমি অবতারিত, তাদেরকে বলবো :

হে সেসব শান্ত চোখ, যারা পরম সুখের দিকেও ঈর্ষাহীন ভাবে তাকাতে পারো, তারা আমাকে আশীর্বাদ করো!

সেই পেয়ালাটিকে আশীর্বাদ করো, যেটা প্রায় উপচে পড়তে চলেছে, যাতে এর পানি এক সোনালী-প্লাবন হতে পারে, যা তোমাদের সুখের প্রতিফলিত দীপ্তিকে সর্বত্র বয়ে নিয়ে যেতে পারে!

দেখো! এই পেয়ালা আবারো খালি হবে, আর যরাথুস্ত্র পুনরায় ইনসানে পরিণত হবে। এভাবে যরাথুস্ত্রের অবনমন শুরু হয়েছিল।'

পরম্পরাগত মতবাদ অনুযায়ী, এ কাজে যরাথুস্ত্র দশ বছর অতিবাহিত করেন। জ্ঞানের পরিপক্কতার বয়সে ত্রিশ বছরে তাকে ওহীর দৃষ্টি দান করা হয়, যার ঘটনা গাহাস (ইয়াসনা : ৪৩) ও পাহ্‌লভি সূত্রে আমাদের কাছে নিম্নরূপে প্রতিভাত হয় :–

বসন্ত-কালের এক উৎসব উদযাপনের জন্য এক জামায়াতে উপস্থিত থাকাকালে পবিত্র অনুষ্ঠানের জন্যে পানি আনতে প্রত্যুষে যরাথুস্ত্র একটি নদীতে গেলেন। মাঝ নদী থেকে পাড়ে ফিরে তীরে তিনি দেবদূতের এক উজ্জল চেহারা দেখতে পেলেন, যে নিজেকে 'বহুমনা' (সদুদ্দেশ্য বা মঙ্গলোদ্দেশ্য)রূপে প্রকাশ করলেন। আহুরা মাজদা (বিজ্ঞ প্রভু) ও অন্য পাঁচ উজ্জ্বল চেহারার (অমরণশীল) উপস্থিতিতে যরাথুস্ত্র তার দ্বারা পরিচালিত হলেন, যাদের সামনে অতি উজ্জ্বল আলোর কারণে তিনি ভূ-পৃষ্ঠে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন না'। আর ঠিক তখনই তিনি তাঁর ওহী লাভ করলেন। তাঁকে ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহ 'সত্য' বা 'মঙ্গল' শেখানো হলো। এটাই ছিল যরাথুস্ত্রের প্রথমবার 'আহুরা মাজদা'-দর্শন অথবা তার উপস্থিতি-বোধ অথবা তার বাণী শ্রবণ।

তিনি ঘোষণা করলেন : 'শুরু থেকেই এজন্যে আমি একান্ত ভাবে তোমারই ছিলাম' (ইয়াসনা ৪৪ : ১১)।

'যখন আমি অধিকার অর্জন করবো, আমি মানুষকে খাঁটি 'আশা' (শৃঙ্খলা, সাধুতা ও ন্যায় বিচার) অন্বেষণের শিক্ষা দেবো'। (ইয়াসনা ২৮ ; ৪।

**উক্ত দর্শন থেকে আলোক প্রাপ্ত হয়ে তিনি বলেন :**

'হে আহুরা মাজদা, তুমি সর্বোচ্চ সদাশয় তত্ত্বাবধায়ক, আমি অবশ্যই তখনই তোমাকে বিশ্বাস করেছি, যখন সৎচেতনা নিয়ে শ্রাসা আমার কাছে এসেছিল, আর আমি তোমার বাণী পেয়ে জ্ঞানার্জন করেছি। এবং কাজটা যদিও কষ্টসাধ্য, যদিও আমি কষ্টে নিপতিত হতে পারি, তবুও আমি সব মানবগোষ্ঠীর কাছে তোমার বাণী প্রচার করবো, যা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে তুমি ঘোষণা করেছ' (ইয়াসনা ৪৩)।

**তিনি মাজদার কাছে প্রার্থনা করেন :**

'হে আহুরা আমি তোমার কাছে জানতে চাই, তুমি সত্যি করে বল, যে ধর্মটি সমগ্র মানবজাতির জন্যে উত্তম, যে ধর্মটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেটারই আমাদের সব কিছুতেই পূর্ণ উন্নতি লাভ করা উচিত, যে-ধর্ম প্রকৃত ধার্মিকতার স্বর্গীয়-গীত দ্বারা আমাদের

কর্মকে শৃঙ্খলা ও ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করবে, যে ধর্মের রয়েছে, হে মাজদা তোমাকে পাবার আকাঙ্খার মত এক বুদ্ধিমান আকাঙ্খা'। (ইয়াসনা ৪৪ : ১০)।

যরাথুস্ত্রকে বুঝানো হয়েছিল যে, তিনি ছিলেন আহুরা মাজদা, বিজ্ঞ প্রভু এবং একমাত্র খোদার বার্তা-বাহক। তিনি বেদোল্লিখিত সব ইরানী-ঈশ্বর এবং তাদের পুরান-শাস্ত্রসমূহ, বলি সংক্রান্ত উৎসর্গ ও পবিত্র 'হোম' পান-এর বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করলেন এবং শুভ ও অশুভ-র মধ্যকার বিশ্বজনীন সংগ্রামে আহুরা মাজদার তাবেদার হলেন।

যরাথুস্ত্র ঘোষণা করলেন যে, আহুরা মাজদা হলেন এক অসৃষ্ট ঈশ্বর, যিনি চির বিদ্যমান এবং অন্যান্য হিতসাধনকারী দেবতা সহ সবকিছুরই স্রষ্টা। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, প্রজ্ঞা, ন্যায়পরতা এবং দয়া প্রাকৃতিক নিয়মেই মন্দ ও নিষ্ঠুরতা থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা।

**তার জ্ঞানের সর্বাধিক প্রত্যক্ষতায় যখন তিনি ঘোষণা করলেন :**

'হে মাজদা, যখন তোমাকে আমি যথার্থ আদি ও অন্ত, সর্বাধিক পূজনীয়, সুচিন্তার জনক, সত্য ও নির্ভুলের স্রষ্টা, আমাদের জীবনে কর্মের সর্বোচ্চ-বিচারক বলে অবহিত হলাম, তখন আমি আমার যথার্থ নজরে তোমার জন্য একটি জায়গা বানিয়ে নিলাম'। (ইয়াসনা ৩১ : ১৮)

**নিজ আত্মার প্রত্যক্ষ পরিচালনায় তিনি বললেন :**

'এভাবে আমি তোমাকে সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করছি! আমি সত্যতার মাধ্যমে জীবিত সব কিছুর সহায়তা ও হিতকল্পে তাঁর-ই জন্যে আমার প্রশংসাগীত রচনা করি। আহুরা মাজদাকে তাঁর পুন্যাত্মা দিয়ে সেসব শ্রবণ করতে দাও, কারণ তিনি আমাকে তাঁর ইবাদত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর জ্ঞান দ্বারা আমাকে সেটাই শেখাতে দাও, যা সর্বোত্তম'। (ইয়াসনা ৪৫ : ৬)।

দর্শনটির মধ্যে যরাথুস্ত্র এক বিরোধী-আত্মা, অজ্ঞ ও সম্পূর্ণ ক্ষতিকর দুশমন 'আংরামমান্যুকে' আহুরা মাজদার পাশে সমাসীন দেখেছিলেন। তিনি নিজেকে মিথ্যার অনুসারীর প্রকৃত শত্রু এবং সত্যের অনুসারীর এক জোরালো-সমর্থকরূপে দাঁড় করালেন। বিজ্ঞ প্রভুর জন্যে তাঁর আবেগপূর্ণ উদ্বেগ এবং তাঁর ধর্মীয় উৎসবাদির চূড়ান্ত অবমাননাকর ও নির্লজ্জ বিকৃতির সাক্ষ্যের মধ্যে তিনি আপোষ করতে পারলেন না। তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সত্যের শত্রু হয় পরিবর্তিত হবে, নয়তো অবশ্যই পরাভূত হবে।

ভারতীয় এবং ইরানীদের এজমালী এক শ্রেণীর দেবদেবীর উপাসকদেরকে সমভাবে আক্রমণ করে বসলেন যরাথুস্ত্র। তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের নেতারা ছিল পুরোহিত-গোত্রীয়। তিনি তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম ও রীতির বিরুদ্ধাচরণ করলেন। মিশন ঘোষণার পর অন্য সব নবীগণের মতো তাঁকেও সাম্প্রদায়িক ও যাজকীয় কর্তৃপক্ষের খুব কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। যরাথুস্ত্র তাঁর নিজ দুর্বলতা ও শিক্ষার বিরোধিতার বিষয়ে সজাগ ছিলেন। জ্ঞাতিবর্গ ও সহকর্মীবৃন্দ কর্তৃক পরিত্যক্ত হবার আশঙ্কা এবং নিজ অভ্যন্তরীণ জেরাসমূহ তাকে গভীরভাবে বিচলিত করে। ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মিশন শুরু হয়, তিনি কেবলমাত্র একজনকে নিজ ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে সফল হয়েছিলেন, এবং সে ছিল তার নিজ জ্ঞাতি ম্যাধ্যোইমাহ্।

নিজ শহরে (চেখোস্ত) তিনি নিরন্তর তিরস্কৃত হতেন। বিনা প্ররোচনায় ক্ষমতাসীন দুর্বিনীত রাজকুমার ও ধর্মযাজকদের আপত্তির কারণে তিনি দুঃখ পেতেন।

**এক পর্যায়ে আহুরা মাজদা সমীপে যরাথুস্ত্র নালিশ করেন ঃ**

'তারা আমাকে পৃথক একাকী করেছে, আত্ম-বিশ্বাসী ছাত্র ও বন্ধুদের থেকে আলাদা হয়ে আমি কোন্ দেশে পাড়ি জমাবো? কোথায় আমার পদক্ষেপ ফেরাবো? আমার সহকর্মীদের একজনও আমার জন্য কোন খুশীর খবর বয়ে আনে না এবং শাসকরা অসত্যের ধারক; এমতাবস্থায় কিভাবে আমি আহুরা মাজদাকে খুশী করব'? (ইয়াসনা ৪৬ : ১)।

আকস্মিক ভাবে একটি আশার আলো তার মধ্যে ঝলকে উঠলো। তিনি তার অবস্থানে স্থির, মিশনে অটল এবং সত্যের চূড়ান্ত বিজয়ের বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন।

'হে প্রভু, আমি কেবল তোমার শিক্ষাগুলোই পছন্দ করি' (ইয়াসনা ৪৬ : ৩)।

'হ্যাঁ সব প্রশংসা তোমারই, হে বিজ্ঞ প্রভু, আমার যাবতীয় প্রশংসা সর্বদা কেবল তোমারই জন্যে'। (ইয়াসনা ৫০ : ৪)।

**পরম্পরাগত মতবাদ অনুসারে, রাজা বিস্তাস্পা এবং কোর্ট অব ব্যাক্টেরিয়ার ধর্মান্তরের সাফল্যের কাহিনী নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে :**

বিয়াল্লিশ বছর বয়সে কতিপয় শিষ্য সহ নিজ শহর ত্যাগ করে পূর্ব ইরানের ব্যাক্টেরিয়ায় হিজরত করলে তিনি আবারো বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হন। নূতন নবীর খবর বল্‌খ-এর স্থানিক রাজা কাভি ভিস্তাস্পার কানে পৌঁছে। তার বিশ্বাসের ব্যাখ্যা দানের জন্য তিনি (রাজা) তাঁকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ করলেন। আলোচনার জন্য রাজা তার উচ্চ পদস্থ যাজকদেরকেও ডাকলেন। যরাথুস্ত্রের শিক্ষার বলিষ্ঠতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা ভিস্তাস্পা যরাথুস্ত্রের প্রতি অসাদাচরণের কারণে যাজকদেরকে তিরস্কার করলেন এবং তার অমাত্যদের বিরূপ অভিমত সত্বেও নূতন ধর্ম গ্রহণ করলেন।

**এ ধরনের আরেকটি গল্প প্রচলিত আছে, যা হলো :**

রাজপ্রাসাদে এক বড় সমাবেশে বিতর্কের তিন দিন পর যরাথুস্ত্র কবি ও কারাপানদের শত্রুতার সম্মুখীন হন। এসব শত্রুরা যরাথুস্ত্রকে জেলখানায় নিক্ষেপের ব্যবস্থা করে। রাজা ভিস্তাস্পার পক্ষাঘাতগ্রস্থ প্রিয় ঘোড়াকে সুস্থ করার মাধ্যমে তার মন জয় করতে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। সেমতে, রাজা ভিস্তাস্পা, রাণী এবং সব উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা সর্বান্তকরণে যরাথুস্ত্রের শিক্ষাকে গ্রহণ করলো। যরাথুস্ত্রের বয়স যখন বিয়াল্লিশ বছর তখন এ ঘটনাটি ঘটে এবং এটা তাঁর ধর্মের সূচনা ও বিস্তারে সহায়তা করে। রাজা ভিস্তাস্পা নিজে যরাথুস্ত্রের ধর্ম কেবল গ্রহণই করেনি, বরং এটাকে তার রাজ্যে প্রচারেও সহযোগিতা করেন।

কিন্তু রাজকুমারের আদালতেও তিনি স্বস্তি পাননি, কারণ সেখানেও তার শত্রুদের তরফ থেকে অবিরত বিরোধী আচরণ করা হতো, যদিও তিনি রাজকীয় সংরক্ষণ ও সমর্থন প্রাপ্তির ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। মন্দ-কর্ম দ্বারা মানব জাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করার জন্যে তাঁর গাথাসমূহে যরাথুস্ত্র রাজকুমার ও যাজকদের নিন্দা করেছেন।

'কখন আমার বন্ধুরা তোমার ধর্মবিস্তারের জন্য উপস্থিত হবে? কখন মিথ্যার এই পচনশীল দলের অবসান হবে, কিসের দ্বারা যাজকরা তাদের প্রতারিতদেরকে মুগ্ধ করবে, কী দিয়ে দুষ্ট শাসকরা দেশে তাদের প্রভাব কায়েম রাখবে, এবং তাদের মন্দ উদ্দেশ্য চালিয়ে যাবে?' (ইয়াসনা ৪৮ : ১০)।

(চলবে)

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা

# আবার 'সত্যের সন্ধানে' অনুষ্ঠান ৭ থেকে ১০ জুলাই, ২০১১

আহমদীয়া মতবাদের উদ্দেশ্যই হলো, আল্লাহ্ ও রাসূলের কথা অনুযায়ী একক ঐশী নেতৃত্বে, ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার বাঁধনে সবাইকে এক করা, ঐক্যবদ্ধ করা। এক কথায় আহমদীয়াতের সারাংশ হলো : ঐক্য, ভালবাসা ও আধ্যাত্মিকতা। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমাদের দায়িত্ব আমরা যেন আমাদের নিজ নিজ গন্ডিতে আমাদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধুবর্গকে আহমদীয়া মতবাদের ঐশী নিয়ামতের সুসংবাদ পৌঁছে দেই। এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আমাদের প্রাণপ্রিয় যুগ-খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বাংলাভাষীদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তবলিগী সভার আয়োজন করেছেন। প্রত্যেক দ্বিতীয় মাসের শেষ বৃহস্পতিবার থেকে টানা চার দিন বাংলাদেশ সময়ানুযায়ী রাতের বেলা MTA International-এর মাধ্যমে তিনি 'সত্যের সন্ধানে' Live Phone-in অনুষ্ঠান অনুমোদন করেছেন। এই সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের ১১তম পর্ব আগামী ৭ জুলাই ২০১১ থেকে ১০ জুলাই ২০১১ পর্যন্ত টানা চার দিন চলবে।

স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে আলোচক বৃন্দ

যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন থেকে বাংলা ভাষায় পরিবেশিত এই তবলিগী সভার নেপথ্যে প্রায় ৩০ জন সেচ্ছাসেবক দিনরাত একাকার করে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। ৬টি ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাভাষীদেরকে ঐশী সত্যের সন্ধান প্রদান করা এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

হুযূর (আই.) এই ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ২৮ অক্টোবর ২০০৯ তাঁর কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে দু'হাত তুলে দোয়াও করেছেন। অতএব হুযূরের এই দোয়ার সর্বাধিক ফলাফল পেতে হলে আমাদেরকে অর্থাৎ আহমদীয়া জামা'তের প্রত্যেককে তবলীগের কাজে এখন থেকেই বিপুল উৎসাহ ও আগ্রহের সাথে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমাদেরকে বিশেষভাবে বাংলাদেশে এই ঐশী নিয়ামতের বাণী পৌঁছে দিতে হবে। আমাদের অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানো একেবারেই সহজ। এখন থেকে এই কাজটা করলে কয়েক দিনের মধ্যেই বিপুল সাড়া পাওয়া সম্ভব। 'সত্যের সন্ধানে' অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে প্রশ্ন করতে এবং সরাসরি সত্য জানতে উৎসাহিত করুন।

## 'সত্যের সন্ধানে' Live Phone-in অনুষ্ঠানে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম

টেলিফোন নম্বর : ০০-৪৪২০৮৬৮৭৮০১০
ফ্যাক্স নং : ০০-৪৪২০৮৬৮৭৮০৩৭
এস এম এস পাঠানোর নম্বর : ০০-৪৪৭৯০৩১১৪৫১২
ইমেইল করার ঠিকানা : **sslive@mta.tv**

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

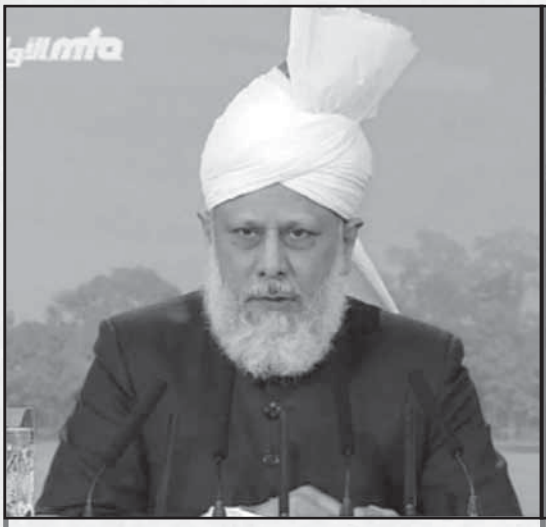

যুগ-খলিফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

গাজীপুরে অনুষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত,বাংলাদেশ -এর ঐতিহাসিক ৮৭তম সালানা জলসায় আগত প্রায় ৮,০০০ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে পুরুষদের জলসাগাহে দর্শকদের একাংশ

## আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ৮৭তম সালানা জলসা উপলক্ষে ৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত

# হযরত মির্যা মসরূর আহমদ

## খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) -এর

# ঐতিহাসিক উদ্বোধনী ভাষণ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তাউয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন ঃ

এখন আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর সালানা জলসায় উদ্বোধনী ভাষণ প্রদানের জন্য দাঁড়িয়েছি। বাংলাদেশ জামা'তের এই সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে একটি নতুন স্থানে। এটি এজন্য ভাড়া নেয়া হয়েছে যাতে অধিক সংখ্যক লোক জলসায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত:, বিরোধীদের একটি দল সেখানে জলসা বন্ধ করানোর দুরভিসন্ধি নিয়ে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মিছিল বের করেছে আর তাদেরকে জলসা বন্ধ করতে বাধ্য করেছে। আসলে এটা জাতির দুর্ভাগ্য বলতে হবে। কেননা, আমাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা সকল প্রতিকূল অবস্থাকেই আমাদের অনুকূলে নিয়ে আসেন। মোটকথা সেখানকার চিত্র হলো, প্রশাসন আমাদেরকে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য জলসার কার্যক্রম চালিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছে। তাই এই অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে নযমও সংক্ষিপ্ত করিয়েছি আর এখন আমি বক্তৃতাও সংক্ষিপ্ত করব। এদের জন্য দোয়া করুন, যেন সেখানকার বৈরী পরিস্থিতিকে আল্লাহ তা'লা সহজ করে দেন।

আমি বলেছি, পুলিশ ও প্রশাসন আমাদেরকে কিছুক্ষণ সময় দিয়েছে অর্থাৎ ৫টার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করতে বলেছে। আমরা আহমদীরা সর্বদা আইন মান্য করে থাকি আর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আমাদের এটিই শিখিয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এই সময়ের মধ্যেই জলসা বা অনুষ্ঠান আমরা সমাপ্ত করব। কেননা আমি পূর্বেই বলেছি কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং আমরা শান্তিপ্রিয় ও শান্তিকামী মানুষ। তাই সরকারের সকল নির্দেশের প্রতি আনুগত্য করা এবং তা মেনে চলা আমাদের জন্য আবশ্যক, যেন দেশে সার্বিক শান্তি বিরাজ করে। আমরা সেই মহান নবী (সা.)-এর অনুসারী, যিনি শান্তি ও মীমাংসার লক্ষ্যে কাফিরদের একতরফা শর্তকেও মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু কোন প্রকার অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন নি। এ স্থানে যেহেতু জলসা অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয় তাই হয়ত জামা'তের নিজস্ব জায়গায় জলসা স্থানান্তরিত হবে আর সেখানেই অনুষ্ঠিত হবে। ততটা পরিব্যাপ্ত না হলেও জলসা সীমিত পরিসরে চলতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। বাইরে থেকে যারা এসেছেন তারা এতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু এই প্রশস্থ জায়গায় জলসা করে জামা'তের পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীর কাছে ইসলামের সুন্দর বাণী পৌঁছানোর যে ইচ্ছা আমাদের ছিল, এদের দুর্ভাগ্য, এরা তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

প্রথম কথা আমি এটি বলতে চাই, বাংলাদেশের যারা জলসার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছেন, তাদের উচিত হবে এই দিনগুলোতে নিজেদের সময়কে, প্রতিটি মুহূর্তকে, দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করা। আর সারা বিশ্বের আহমদীদেরও উচিত হবে তাদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখা। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা একদিন অবশ্যই আমাদের দোয়ার ফল প্রকাশিত হবে আর এ সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। **কিন্তু এ সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সংখ্যালঘিষ্ঠতায় পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা মেনে চলা একান্ত আবশ্যক। আর তা হলো, আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান বা তবলীগের কাজ।** এ কাজ আমাদেরকে সর্বাবস্থায় করে যেতে হবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা, আর তা কখনো পরিত্যাগ করা যাবে না।

এ লক্ষ্যে **আমি বিশেষ করে বাংলাদেশ জামা'তের প্রশাসন ও অঙ্গসংগঠনগুলোর উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করুন। একটি বাস্তবধর্মী ও উৎকৃষ্ট কর্মসূচি হাতে নিন এবং আহমদীয়াতের তবলীগ বা সত্যের বাণী দেশের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিন।** আর এই কাজের সুফল তখনই আসবে যখন বাণী পৌঁছানোর পাশাপাশি আমরা নিজ নিজ কর্মের প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দেবো। আমাদের শিক্ষা ও বাণীর সাথে আমাদের কর্মের মিল থাকলেই কেবল এটি সম্ভব হবে। অন্যথায় পৃথিবীবাসী বলবে, তুমি আমাকে কি উপদেশ দিচ্ছ? আমাকে কোন মুখে তবলীগ করছ? কোন মুখে আমাকে ইসলামের বাণী শোনাচ্ছ? আমার সামনে ইসলামের কোন্ সৌন্দর্যের বুলি আওড়াচ্ছ? কোন মুখে আমাকে বলছ, মহানবী (সা.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এবং পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী - وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ('ওয়া 'আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাকু' বিহিম) অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসে গেছেন? যেসব বিষয়ের দিকে তুমি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছ আর গর্বের সাথে বলছ, বল দেখি, সেসব কথা তোমার মাঝে কি পরিবর্তন এনেছে? এজন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেন, শুধু আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আহবানকারী হলেই মানুষ শ্রেষ্ঠভাষী হয় না বরং সৎকর্মের দৃষ্টান্ত বা স্বাক্ষর রাখাও অবশ্যক। কেননা সে কথাই অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে যা বর্ণনাকারী নিজে মেনে চলে। যে ব্যক্তি নিজেই মিথ্যার আশ্রয় নেয় সে কীভাবে অন্যকে সত্যের উপদেশ দিতে পারে?

কাজেই **আল্লাহ্ তা'লার বাণীর প্রচার করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন করতে হবে। প্রত্যেক আহমদীর নিজেকে আহমদীয়াতের দূত মনে করতে হবে। আমাদের কর্ম ও আচরণ সেই শিক্ষাসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয় যা আমরা প্রচার করছি। আর তা হল, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ শরিয়তের শেষ গ্রন্থ পবিত্র কুরআন, যাঁর আগমনে শরিয়ত পূর্ণতা লাভ করেছে।** পবিত্র কুরআনে শত শত আদেশ-নিষেধ আছে যা একজন মু'মিনকে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা এর অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের সকল নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা কর, তবেই সৎকর্মশীল আখ্যা পাবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামনে মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ রেখে এটি প্রমাণ করেছেন যে, যেসব কথা বা কাজ করার নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে এর সবচেয়ে মহান মানদন্ড তোমাদের সামনে রয়েছে। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী কাজ করে থাকে। কারো কারো সামর্থ বা যোগ্যতা কম হয়ে থাকে সত্য, কিন্তু সবার জন্য এসব

নির্দেশাবলী মেনে চলা এবং এ সকল কাজ করার চেষ্টা করা আবশ্যক আর খোদা তা'লা এটি বাধ্যতামূলক করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী মেনে চলার সদুপদেশ দিয়েছেন। হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর আদর্শ অনুসারে জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, **'সকল আদেশ-নিষেধ, নৈতিক শিক্ষা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'** তিনি আরো বলেন, **'মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক উৎকর্ষকে প্রতিবিম্ব আকারে ধারণ করার ক্ষমতা যদি আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতিতে প্রথিত না থাকত তাহলে কখনোই এই নির্দেশ দেয়া হতো না যে, তোমরা এই সম্মানিত রাসূলের অনুসরণ কর। কেননা আল্লাহ্ তা'লা কারো কাঁধে সাধ্যাতিত বোঝা চাপান না। তিনি স্বয়ং বলেন,**

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط

**('লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা')।**

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.)-এর এই উক্তি বড়ই চমৎকার, **কুরআনের শিক্ষাই ছিল তাঁর আচরিত জীবন।** কাজেই আমরা যখন আমাদের নিজেদের কর্মের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবো এবং আমাদের দুর্বলতাগুলো খতিয়ে দেখবো তখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে এ কাজগুলো করার শক্তিও কামনা করবো। আর এভাবেই আমাদের কর্ম ক্রমশ: উন্নততর হতে থাকবে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৎকর্মের তৌফিক দিতে থাকবেন আর নেক কর্মের গন্ডি ক্রমপ্রসারমান রাখবেন।

**আমাদের অবস্থা এমন হলে আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আহ্বান বা তবলীগের কাজ উত্তমভাবে সম্পাদন করতে পারব।** আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই কাজে বরকত দিবেন। আমাদের দাবী নিছক বুলি সর্বস্ব হবে না বরং আমরা আমাদের প্রচারিত শিক্ষার মূর্তিমান রূপ হবো। আর এটি ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রচার বা তবলীগের কাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। আল্লাহ্ তা'লা সৎকর্ম, সত্যের প্রতি আহবান এবং এ উদ্দেশ্যে সৎকর্ম সম্পাদনের পাশাপাশি-

اِنَّنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ('ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন')

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আমি পূর্ণ আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত' -ঘোষণা প্রদান করাও আবশ্যক আখ্যা দিয়েছেন।

যদি কোন সৎকর্ম করা হয়, তাহলে তা আনুগত্যের সুবাদেই করা হবে। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক, যত উন্নতমানের সৎকর্মই করা হোক না কেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা কোন বরকত বয়ে আনবে না আর আমরা তা থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারবো না যতক্ষণ আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য করত: প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য না করবো। আর যদি এ যুগের ইমামকে মান্য করে খোদার নির্দেশাবলী শিরোধার্য করত: এক জামা'তে সম্পৃক্ত হয়ে আমরা স্বীয় দায়িত্ব পালন করি আর আল্লাহ্র বাণীর প্রচার করি কেবলমাত্র তাহলেই

নামাযে সিজদারত জলসায় অংশগ্রহণকারী মুসল্লিদের একাংশ

পূর্ণরূপে আনুগত্য করা হবে। যেহেতু আমরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশানুসারে যুগ-ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে তাঁর সালাম পৌঁছিয়েছি, তাই আমাদের উচিত হবে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। যখন আমরা রাসূলে করীম (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে তাঁর সালাম পৌঁছিয়েছি, তাঁর হাতে বয়'আত করেছি, তাই আমাদেরকে তাঁর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতে হবে।

**তবলীগের জন্য কেবল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয় বরং একটি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সুসংহত ও সুদৃঢ় পরিকল্পনা করতে হবে। সর্বদা স্মরণ রাখবেন, একক ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত নেককর্মের সমষ্টি জামা'তকে দৃঢ়তর করে থাকে। আর যদি এই সৎকর্মশীলরা পূর্ণ আনুগত্যের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে এক নেতার কথানুসারে আল্লাহ্ তা'লার দিকে আহ্বান করতে থাকে তাহলে পৃথিবীতে তারা একটি বিপ্লব সাধনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।**

মহানবী (সা.) এ যুগের ঈমান আনয়নকারীদের কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে কল্যাণের সুসংবাদ শুনিয়েছেন যারা এক ঐক্যবদ্ধ জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।

নামসর্বস্ব জামা'ত বা সংগঠন অনেক আছে, কিন্তু পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় আমলকারী আর একহাতে বয়'আতকারী জামা'ত হলো একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত। তাই প্রত্যেক আহমদীকে তার নিজের এই গুরুত্ব অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক। আর এ কথা জামা'তের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত পরিচালকদের জন্য ভাবার বিষয়। যদি তাঁরা আমানতের গুরুত্ব অনুধাবন না করে যার সম্পর্কে আমি গত খুতবায় উল্লেখ করেছি তাহলে তারাও জিজ্ঞাসিত হবে। এমন আমানত যা বহণ করতে সকলেই অস্বীকার করেছিল। কিন্তু পরিপূর্ণ মানব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) নিজের প্রতি বাহ্যত: অবিচার করে এই আমানতের বোঝা স্বীয় কাঁধে তুলে নেন আর এই আমানতই শেষ যুগে মুহাম্মদী মসীহ্‌র মান্যকারীদের প্রতি ন্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর মান্যকারীরা যদি আমানতের ব্যাপারে সচেতন না হয় তাহলে তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হবে এবং এটা বড়ই দুশ্চিন্তার কারণ।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে **আমি জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং খোদ্দাম, আনসার ও লাজনাসহ সকল অঙ্গ-সংগঠনকে বলছি, নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে সচেতন হোন এবং যথাযথভাবে আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ করুন। শুধু সদস্যদের কাছে পরিপূর্ণ আনুগত্যের আশায় বসে থাকবেন না বরং নিজেদের দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করুন। আমাদের চেষ্টা যদি আরো সুসংহত ও দৃঢ় হয় তাহলে আমরা সমস্ত ব্যবস্থাপনাকে সক্রিয় করতে পারবো। সর্বমুখী চেষ্টা হলে, দাওয়াত ইলাল্লাহ্'র কাজ আরো কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে, যে ক্ষেত্রে এখনও অনেক ঘাটতি আছে।** কোন কোন রিপোর্ট দেখে আমার মনে হয়, বাংলাদেশে যতটা কাজ হতে পারে ততটা হচ্ছে না। আশা করি এখন পর্যন্ত যত আলস্য প্রদর্শন করা হয়েছে তা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করা হবে। সফলতা কিংবা বিরোধিতা যে সুযোগই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দিন না কেন, তা যেন আমাদের অগ্রগতির কারণ হয় আর তা থেকে যেন আমরা শিক্ষা নেই। **আজকেও বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে বিরোধিতা হয়েছে, যদি আমাদের প্রচেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন হতো তাহলে হয়ত এদের অনেকেই এখন আমাদের মাঝে বসা থাকত।**

**আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশীরা অনেক বেশি আলোকিত চিন্তাধারা ও আলোকিত মন-মানসিকতার অধিকারী এবং বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন। এরা সত্য অনুধাবন করতে পারলে তা গ্রহণের চেষ্টা করে। এখনও বাংলাদেশে অনেক সুশিক্ষিত মানুষ আছেন যারা আহমদীয়া জামা'তের বাণী'কে বুঝেন, এ জামা'তের শিক্ষা অনুধাবন করেন। যদিও তারা আমাদের জামা'তভূক্ত নন, সরাসরি জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত নন কিন্তু জামা'তী শিক্ষার সৌন্দর্য অনুধাবন করেন, যার ফলে সর্বদা জামা'তকে সঙ্গ দিয়ে থাকেন। একইভাবে গ্রাম ও উপশহরে বসবাসকারী ভদ্রব্যক্তিরা জামা'তের শিক্ষাকে বুঝার কারণে বিরোধিতার সময় আমাদের সঙ্গ দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বিরোধিতা অনেক কম এবং জামা'ত ভাল অবস্থানে আছে। আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দাওয়াত ইলাল্লাহ্ বা সত্য প্রচারের কাজ আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই আমাদের প্রচার ব্যবস্থা তথা তবলীগকে আরও সুসংহত করা প্রয়োজন।** দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র বা তবলীগের কাজকে অধিক গতিশীল করার চেষ্টা করুন যেন আজ যে বিরোধীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মনে হচ্ছে অচিরেই তারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়।

এই দিনগুলো দোয়ার মাঝে রত থেকে অতিবাহিত করুন। নিজেদের ব্যক্তিগত অভিযোগ ও অনুযোগ পরিহার করুন। একটিমাত্র উদ্দেশ্যই সামনে থাকা উচিত। তাহলো, হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর বাণী আমাদেরকে সারা পৃথিবীতে পৌঁছাতে হবে যা প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার বাণী, যা মূলতঃ খোদা তা'লার পানে নিয়ে যাবার বাণী। যেন আমাদের জাতি প্রকৃত অর্থে **উম্মতে মুসলিমা** আখ্যা পেতে পারে।

সর্বদা স্মরণ রাখবেন, আমাদের ঈমানে যখন দৃঢ়তা সৃষ্টি হবে, আমাদের উদ্দেশ্য যখন পবিত্র হবে আর আমরা যদি দৃঢ়চিত্ত সাব্যস্ত হই তাহলে খোদা তা'লা আমাদের ক্রমাগত চেষ্টার ফলে আমাদেরকে অশেষ কল্যাণে ভূষিত করতে থাকবেন। আর আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে যে নির্ধারিত বিপ্লব আছে আমরাও এর অংশীদার হতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে সেই সুযোগ দিন।

পারস্পরিক ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ গড়ে তোলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক বর্ণিত জলসার উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভূক্ত। তাই উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার পরিবেশ গড়ে তুলুন। কেবল এখানে অবস্থানকালেই নয় বরং যখন নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাবেন, সেখানেও সর্বদা প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার পরিবেশ বজায় রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। জলসার অবশিষ্ট কার্যক্রম কল্যাণজনকভাবে সমাপ্ত হোক আর আপনারা সবাই মঙ্গলমত ও নিরাপদে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান এটিই কাম্য। ■

অনুবাদঃ মাহমুদ আহমদ সুমন এবং বাংলা ডেস্ক, লন্ডন।
প্রকাশনা বিভাগের পক্ষ থেকে সম্পাদিত।

# ইসলামে সামাজিক জীবন

সরফরাজ এম. এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষকে কেন্দ্র করে মানুষেরই কল্যাণের নিমিত্ত আল্লাহ্ তাআলা আসমান, যমীন, চন্দ্র, সূর্য্য, নদ-নদী, বৃক্ষ-লতা, পাহাড়-পর্বত, অগ্নি, জল, আলো, হাওয়া, কীটপতঙ্গ, পশু-পাশি, অণু, পরমাণু ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তাআলার হুকুম সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু একটি বিশেষ বিধান অনুযায়ী মানুষের সেবায় নিয়োজিত আছে। ইসলাম প্রবর্তক হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "মানুষ সকলেই এক আদমের সন্তান আর আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে।"

হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র বাণী থেকে জানা যায়, মানুষ হিসাবে সবাই সমান। সকলই পরস্পর ভাই ভাই। এই মানুষ যাতে পৃথিবীর বুকে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে তজ্জন্যই ধর্মীয় বিধান। সুতরাং মানুষের মঙ্গলের জন্যই ধর্ম। মানুষের জন্য যা অকল্যাণকর তা-ই অধর্ম। যাদের দ্বারা মানুষের মঙ্গল সাধিত হয় তারাই ধার্মিক। আর যাদের দ্বারা মানুষের অমঙ্গল হয় তারাই অধার্মিক।

মানুষ যখনই বিশ্ব বিধাতার দেওয়া বিধানকে ভুলে গিয়ে সংসারের মোহ মায়ার আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ, দলা-দলি, রেষারেষিতে মত্ত হয়ে যায় তখন সৃষ্টির সেরা সেই মানুষই পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গিয়ে পরস্পর ঝগড়া কলহ, অন্যায়-অবিচার, যুলুম-নির্যাতন, মারামারি ইত্যাদি অহিতকর ক্রীড়ায় লিপ্ত হয়ে সমাজ জীবনে এক মহা বিপর্যয় আনয়ন করে।

তখন আল্লাহ্ তাআলা বান্দার প্রতি তাঁর করুণার নিদর্শন রূপে সেই অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত মানবজাতিকে উদ্ধার করত: মানবতার উচ্চাসনে উন্নীত করার নিমিত্তে প্রতি যুগে যুগে মানুষেরই মধ্যে থেকে মানুষেরই কল্যাণের জন্য নবী-রাসূলের উদ্ভব করেন।

শুরুতে মানুষ একই জাতিভুক্ত ছিল, ক্রমান্বয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক নানান কারণে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক জাতি বা দলের মধ্যেই নবী রাসূলের আবির্ভাব করেছেন। পাক কালামে আল্লাহ্ তাআলা হযরত রাসূল করীম (সা.)-কে বলেন, "তোমার পূর্বে আমি অসংখ্য নবী প্রেরণ করেছি তন্মধ্যে কতক নবীর নাম তোমার নিকট উল্লেখ করেছি এবং তন্মধ্যে তোমার নিকট কতক নবীর নাম উল্লেখ করিনি।" (সূরা আল মু'মিন) "নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জাতির ভিতর নবী প্রেরণ করেছি।" (সূরা আন নাহল) "প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক ছিলেন।" (সূরা রা'দ) পৃথিবীতে এমন কোন জাতি বা দল নেই যাদের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা নবী রাসূলের উদ্ভব করেন নি। যখন তাতে (জাহান্নামে) কোন জনসমষ্টি নিক্ষিপ্ত হবে তার কর্মচারীরা সেই সকল লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেন নি?

তারা প্রথমে বলবে হ্যাঁ, সতর্ককারী আমাদের নিকট এসেছিল বটে কিন্তু আমরা তাঁকে অমান্য ও অবিশ্বাস করেছি।" (সূরা মূলক) আল্লাহ্‌র প্রেরিত সেই সব নবী রাসূলের একই কাজ ছিল মানুষকে বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তাআলার পরিচয় করিয়ে তাঁর সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করতে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় অবিচার, যুলুম-নির্যাতন ইত্যাদি শোক, দুঃখ, দৈন্য দুরিভূত করে একটি সুশৃংখল বিধানের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

তখনকার দিনে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল না। এক দেশের মানুষ আরেক দেশের মানুষ সম্বন্ধে ছিল অপরিচিত ও অজ্ঞাত। যারা যে জায়গায় বাস করতো তারা সেই জায়গাটাকেই ধারণা করতো গোটা পৃথিবী। তাদের জন্য ধর্ম ছিল তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন হয়েছিল শুধু ইসরাঈল কুলের হারানো মেষগুলির উদ্ধারকল্পে। যেমন তিনি বলেছেন, "ইসরাঈল কুলের হারানো মেষ ছাড়া আর কাহারো নিকট আমি প্রেরিত হয়নি।" (মথি : ১৫ : ২৪)

তখনকার দিনে নবী রাসূলগণ আগমন করতেন খন্ড খন্ড দেশে, খন্ড খন্ড জাতির জন্য, সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য নয়। কোন ধর্মেরই কোন নাম এবং কোন কলেমা ছিল না। যেমন যীশু খ্রীষ্টের অনুসারীগণকে যীশু খ্রীষ্টের নামানুসারে বলা হয় খ্রিষ্টান। গৌতমবুদ্ধের নামানুসারে বুদ্ধদেবের অনুসারীদেরকে বলা হয় বৌদ্ধ। তেমনিভাবে হিন্দুধর্মের উৎপত্তিস্থল 'সিন্ধু' নামানুসারে হিন্দুজাতিকে বলা হয় হিন্দু বা ইন্দু।

অর্থাৎ তখনকার ধর্ম পরিপূর্ণ ছিল না।

অত:পর এমন একদিন এলো যখন যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়ে একদেশের মানুষ আরেক দেশের মানুষের সাথে যোগাযোগ ও পরিচয় হলো, আদান প্রদানের ব্যবস্থা স্থাপিত হলো তখনই মহান আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বের সকল জাতির সকল মানুষের জন্য প্রেরণ করলেন বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-কে। তিনি রাহমাতুল্লীল আলামিন অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের রহমত।

তাঁরই মারফত ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে পরিসমাপ্তী ঘটেছে। তাঁরই প্রবর্তিত ধর্মের নাম ইসলাম। যাঁর অনুসারীগণকে বলা হয় অনুগত মুসলমান। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে হযরত আদম (আ.) থেকে এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে পরিসমাপ্তি ঘটেছে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে। যেভাবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, "আজ আমরা তোমাদের জন্য সম্পন্ন করলাম তোমাদের ধর্মকে এবং তোমাদের প্রতি পূর্ণ করলাম আমার নিয়ামত এবং তোমাদের জন্য ইসলাম (আত্মসমর্পণকরা)-কে ধর্ম হিসেবে পছন্দ করলাম।" (সূরা মায়েদা)

বিদায় হজ্জের পবিত্র ভাষণে হযরত রাসূলে পাক (সা.) আবেগ মথিত কণ্ঠে বলেছিলেন, অন্ধকার যুগের সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত মিথ্যা বিশ্বাস, সকল প্রকার অনাচার আজ আমার পায়ের তলে দলিত হয়ে রহিত ও বাতিল হয়ে গেল। একজনের অপরাধে অন্যকে দন্ড দেওয়া যাবে না। এখন থেকে পিতার অপরাধে পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধে পিতাকে দায়ী করা চলবে না। এক দেশে ও এক জাতির, অন্য দেশ ও অন্য জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করার কোনই কারণ নেই।

মানুষ সকলই আদম সন্তান এবং আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে। সাবধান! কোন মানুষের উপর অত্যাচার করো না, যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতগণকে এই বার্তা পৌঁছে দিও। ভাষণ শেষে মহানবী (সা.) সমবেত শ্রোতামন্ডলীকে প্রশ্ন করেন তিনি তাদের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন কিনা। লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, নিশ্চয় হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আপনার কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করেছেন। তখন আবেগ

ভরে মহানবী (সা.) আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, হে আল্লাহ্! এরা সাক্ষ্য দিচ্ছে তুমি অবলোকন কর। তারপর তিনি সকলের দিকে লক্ষ্য করে করুণ কণ্ঠে শুধু বলেন, "আল বিদা" অর্থাৎ বিদায়।

মহানবী (সা.) বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা বিপদাপদের পাহাড়-পর্বত পাড়ি দিয়ে উঁচু-নীচ, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কলো, রাজা, প্রজা, ইত্যাদি ভেদ বৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত করে আরবের বুকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাম্য ও মৈত্র ভিত্তিক শোষনমুক্ত এক আদর্শ সমাজ। সে সমাজে থাকবে না রাজা-বাদশা, থাকবে না মানুষের উপর মানুষের ভেদ বৈষম্য ও যুলম-নির্যাতন, অত্যাচার আর শোষন বঞ্চনা। এক মানুষ আরেক মানুষের ভাই। সুখে-দুঃখে একজন আরেকজনের সমান অংশীদার।

মহানবী (সা.) এরশাদ করেছেন, মানুষের মধ্যে তিনিই উত্তম যার দ্বারা মানব জাতির কল্যাণ সাধিত হয়। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সকল প্রাণী নিয়ে তাঁর পরিবার, তিনিই আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয় যিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রাণীগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরব, পারস্য বা অন্য কোন দেশ বা জাতির নবী নহেন। তিনি বিশ্বের সকল জাতির সকল মানুষের নবী। তাঁকে মেনে চললে অতীত যুগে আল্লাহ্‌র প্রেরিত সকল নবী ও সকল ধর্মগ্রন্থকেই মান্য করা হয়। তাঁকে না মানলে কোন ধর্মকেই মানা হয় না। তাঁর মধ্যে দিয়েই মানব-ধর্ম পূর্ণত্ব লাভ করেছে। ইতিহাসের এমনি এক ক্রান্তি লগ্নে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব হলো যখন মানুষের উপর দাসত্বের যুলমপূর্ণ স্টীম রোলার চালিয়ে মানবতাকে করেছিল দলিত-মথিত। শুধু আরবের বুকেই নয়, সমগ্র দুনিয়ার একই অবস্থা ছিল। দাসত্বের লা'নতে পশুর ন্যায় আদম সন্তানেরা খাঁচাবদ্ধ হয়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় চিৎকার ও ছটফট করতো। হযরত রাসূলে পাক (সা.) এমনি দুর্দিনে মানবতার মুক্তি দান করে মানুষের ন্যায্য অধিকার ও মানবীয় মর্যাদাকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি শিক্ষা দিলেন, চারিত্রিক আদর্শে পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করতে।

বাহু বলে রাজ্য জয় করা যায় কিন্তু মানুষের অন্তর জয় করা যায় না। ইসলামের একজন দাস স্বীয় চারিত্রিক ও কর্ম দক্ষতার গুণে নেতা হতে পারে। ইতিহাসে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শুধুমাত্র দাস প্রথাকেই নির্মূল করেন নি এবং উঁচু-নীচু, সাদা-কালো ইত্যাদি বর্ণবৈষম্যের মূল উৎপাটন করে দুর্বলের উপরে প্রবলের প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়ে সৃষ্টির সেরা মানুষ হিসেবে সবাইকে দিলেন সমান মর্যাদা। আরব অনারবে রইল না কোন পার্থক্য। মানুষ হিসেবে সবাই সমান। রাজতন্ত্রকে করলেন তিনি চিরকালের জন্য কবরস্থ, থাকল না রাজা প্রজার নাম গন্ধ।

ইসলাম জাতি-বর্ন-ধর্ম-গোত্র, ধনী-দরিদ্র, সক্ষম-অক্ষম নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার ইসলামের অন্যতম সামাজিক মূল্যবোধের দৃষ্টিতে মানুষ সকলই সমান। মসজিদে কারো জন্য নেই কোন ভিন্ন কাতার। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের বড় বৈশিষ্ট্য। ইসলামে সে-ই বেশি সম্মানীত যিনি বেশী মুত্তাকী।

কোন ব্যক্তি যদি ভাল চরিত্রের অধিকারী হয়, তবে সে নিজে যেমন উপকৃত হয় তেমনি আরো দশজন তার দ্বারা উপকৃত হয়। উৎকৃষ্ট চরিত্রের গুণে গড়ে ওঠে একটা আদর্শ ও চরিত্রবান পরিবার। তাদের দ্বারাই ক্রমশ: গড়ে ওঠে আদর্শ সমাজ জীবন ও জাতীয় জীবন। সৎ গুণাবলীর দ্বারাই মানুষ অপরের কাছে হয় শ্রদ্ধা ও প্রশংসার পাত্র। মানুষের সৎ গুণাবলীই হলো ভাল-মন্দের মাপকাঠি।

দুনিয়ার সবাই ভাল জিনিসের প্রশংসা করে। মন্দ হলে এর প্রতি করে ঘৃণা। ইসলাম সবাইকে সৎ গুণাবলীর অধীকারী হয়ে আদর্শ সমাজ জীবন গঠন করে জাতীয় সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়াতে বলে। নারী এবং পুরুষ উভয়ে মিলেই সমাজ জীবন। নারীরাও মানুষ। পুরুষের ন্যায় তাদেরও আছে প্রাণ। মানবজাতির এক অংশকে বাদ দিয়ে কখনও সমাজের মঙ্গল কামনা করা যেতে পারে না। নারী বিহলে পুরুষের জীবন অসার, পুরুষ বিহনে নারী জীবন মরুভূমি সমতুল্য।

নারী এবং পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। একের অভাবে অন্যের জীবন অপূরক। দুইয়ে মিলেই পূর্ণতা। তাই ইসলামে স্ত্রীকে বলা হয়েছে অর্ধাঙ্গীন। ইসলামের আগে সমাজে নারী জাতির কোন মর্যাদা ছিল না। তারা ছিল পুরুষের ভোগ বিলাসের পাত্র। তাদের সাথে করা হতো যথেচ্ছো ব্যবহার। পিতা এবং স্বামীর সম্পত্তির কোন অংশ তারা পেত না। এমনকি মানুষ হিসেবে সমাজে তাদের কোন স্থান ছিল না।

তাদেরকে নরকের দ্বার, শয়তানের কাঠি ইত্যাদি বলে উপেক্ষা করা হতো। কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করলে স্বয়ং পিতা নিজ হাতে তাকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতো না। ইসলাম সেই অবহেলিত নারীজাতিকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে পুরুষের মত সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম সমগ্র বিশ্বের একটি সুষ্ঠ ও সুন্দর সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছে। সমাজের একতা, শৃংখলা ও সৌভ্রাতৃত্বকে বজায় রাখতে হলে একজন নেতার অবশ্যই প্রয়োজন। কোন একজন নেতা ব্যতীত কোন জামা'ত বা দল গঠন হয় না, একতা শৃঙ্খলা বজায় রেখে একটি সুষ্ঠ ও সুন্দর সামাজিক জীবন কায়েম হতে পারে না।

নেতার আনুগত্য ব্যতীত জাতির উন্নতি নেই। তাই আল্লাহ্ ও রাসূল করীম (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানগণ যেন নেতাকে অবশ্য মান্য করে এবং তাঁর আদেশ মত চলে। হুযূর (সা.) এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি, আল্লাহকে ভয় করতে, আমার উত্তরাধিকারীর অনুগত হতে তিনি কৃষ্ণকায় কৃতদাস হলেও। যে ব্যক্তি জামা'ত থেকে এক বিঘত দুরে সরে যায়, সে ব্যক্তি নিজের স্কন্ধ থেকে ইসলামের জোঁয়াল নামিয়ে দেয়। (মেশকাত)

তিনি আরও বলেছেন, জামা'তের উপর আল্লাহ্‌র হাত স্থাপিত এবং যে ব্যক্তি জামা'ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে (মেশকাত)। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য বিশ্বের সমগ্র মানবজাতিকে একত্রিত করে একই শান্তির পতাকা তলে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেয়া। পবিত্র কুরআন করীমে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকাকে মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আল্লাহ্ তাআলা বর্ণনা করেছেন। ইসলামই একমাত্র ধর্মীয় বিধান যা মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকাকে উন্নতির চাবিকাঠি ও অন্যতম বৈশিষ্ট বলে বর্ণনা করেছে। ইসলাম প্রবর্তক হযরত রাসূল করীম (সা.) শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকার উপর বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছেন।

মুসলমান যেন একজন নেতার অধীনে এক জামা'তভুক্তভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে। পবিত্র কুরআনে কঠোর হুশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে মুসলমান জাতিকে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর যেমন ভয় করা উচিত, তোমরা অনুগত (মুসলমান) না হয়ে মরিও না।

আর তোমরা সকলে মিলে একত্রে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে (খিলাফত) দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। সাবধান! দলে দলে বিভক্ত হয়ো না এবং স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কথা, যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, তারপর তিনি তোমাদের মনে ভালবাসার সৃষ্টি করে দিলেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তোমরা সকলে ভাই ভাই হয়ে গেলে" (আলে ইমরান)।

(চলবে)

# আল্লাহ্ বিলাসিতা পছন্দ করেন না

মাহমুদ আহমদ সুমন

কিছুদিন পূর্বে একটি জাতীয় পত্রিকার একটি সংবাদের প্রতি দৃষ্টি পরলো। সংবাদটি পড়ে অবাক হলাম। সংবাদটির শিরোনাম ছিল 'মাদ্রাসা পরিচালকের হেলিকপ্টার ভ্রমণ'। বলা হয় চট্টগ্রামের হাটহাজারী দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদ্রসার পরিচালক, বাংলাদেশ ওলামা পরিষদ ও কওমি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আল্ল?ামা শফি আহমদ কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবে নিজ এলাকায় নিজের নামে প্রতিষ্ঠিত একটি মাদ্রাসার সম্মেলনে যোগ দিতে ভাড়া করেছেন বিপুল অর্থ ব্যয়ে হেলিকপ্টার। বেসরকারি সাউথ এশিয়ান এয়ারলাইন্সের এই হেলিকপ্টারটি কয়েক লাখ টাকায় ভাড়া করা হয়েছে বলে মাদ্রাসা সূত্র জানিয়েছে।

আমরা এমন একটি দেশে বাস করি যেখানে দু'বেলা খাবার সংগ্রহ করাই অনেকের জন্য কষ্টকর সেখানে হেলিকপ্টারে চড়ে ভ্রমণ এটা নি:সন্দেহে বিলাসিতা ছাড়া কিছুই নয়। পবিত্র কুরআন, হাদীসের কোথাও বিলাসি জীবন-যাপনের কোন অনুমতি আছে কিনা তা আমার জানা নেই। আমরা জানি, এ পৃথিবীতে যত নবী-রাসূলগণ এসেছেন তারা কতই না মিতব্যয়ী ছিলেন। নবী-রাসূলদের জীবন কত সহজ-সরল ছিল তা আমরা শ্রেষ্ঠ নবী খাতামান নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কর্মময় জীবন থেকে সহজেই জানতে পারি।

প্রশ্ন হল একজন আলেম হয়ে তিনি কিভাবে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে হেলিকপ্টারে চড়ে ভ্রমণ করেন? মাদ্রাসার শিক্ষকরাতো মাদ্রাসা থেকে যা মাসিক ভাতা পান তা দিয়ে সংসার চালিয়ে থাকেন। যিনি এতো বড় একটা অপচয় করলেন তিনি কি জানেন না, তার পাশের ঘরের পরিবারটি যে না খেয়ে রাত্রি যাপন করছেন? রোজ কিয়ামতে তিনি এর কি জবাব দিবেন? কয়েক মিনিটের মধ্যে যে অপচয় তিনি করলেন তা দিয়ে হয়তো এদেশের হাজার হাজার এতিম শিশুর কয়েক মাসের খাবার হয়ে যেত। আমরা বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উদাহরণ দিয়ে বলে থাকি তারা অযথা খরচ করে কিন্তু এখনতো দেখছি আলেমরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। একজন আলেম নিজেই যদি অপচয়কারি হয় তাহলে সে কিভাবে জাতিকে সংশোধনের রাস্তা দেখাবে?

ইসলামসহ কোন ধর্মই অপব্যয়ের শিক্ষা দেয় না। চাহিদা মোতাবেক খরচ করতে ইসলাম নিষেধ করে না। কিন্তু প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও খরচ করা এটাই অপচয়, আর এমন কাজই ইসলামে নিষেধ। অপচয় প্রসঙ্গে মহান খোদা তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেনঃ এবং আহার কর ও পান কর, তবে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না (সূরা আল আ'রাফ : ৩২)। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভূ-প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ, ( সূরা বনী ইসরাঈল : ২৮)।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন-তোমরা খাও, পান কর, দান সদকা কর এবং পরিধান কর যে পর্যন্ত না অপব্যয় ও অহংকারে পতিত হও, (নিসাঈ, ইবনে মাজাহ)।

কোন ভাবেই অপব্যয় করা যাবে না এটাই ইসলামের শিক্ষা। যারা বিনা কারনে অপব্যয় করেন তাদেরকে খোদা তাআলা ভালবাসেন না। আমরা নামায পড়ি, রোজা রাখি আর অন্যান্য ভাল কাজও করছি কিন্তু অপব্যয় যে অনেক ক্ষেত্রে করে যাচ্ছি এমনটা হলে তো আমাদের ইবাদত বন্দেগি কোন কাজে আসবে না। খোদা তাআলার সন্তুষ্টি আমরা তখনই লাভ করব যখন তাঁর প্রতিটি আদেশের ওপর আমরা আমল করব। আমরা যদি সব ক্ষেত্রে অপব্যয় বন্ধ করি তাহলে দেখা যাবে ব্যক্তিগত ও জাতীয় উভয় দিকে অনেক সফলতা আসছে আর দিনের পর দিন অনেক উন্নতি করছি। মহান খোদা তাআলা আমাদের সবাইকে অপব্যয় করা থেকে দুরে রাখুন আর এমন আলেমদেরকে এটা উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

## কৃতী ছাত্র/ ছাত্রী

* সাব্বির আহমদ (মুত্তাকী) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শালশিড়ি'র একজন ওয়াকফে নও খাদেম। সে ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত এস. এস. সি পরীক্ষায় জি.পি.এ-৫ পেয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

তার পিতা মৌ. হুমায়ুন কবীর, মোয়াল্লেম এবং মাতা মরিয়ম বেগম খুকি ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী।

**ডা: মোহাম্মদ তৌফিক-ই-ইলাহী**

* আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে আমার ছোট মেয়ে নওরীন আফরোজ (ওয়াকফে নও নং- ১০৪৫২-A) লালমনিরহাট সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হতে ২০১১ সালের এস. এস. সি পরীক্ষায় (দিনাজপুর বোর্ড) বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জি.পি.এ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

আরো উল্লেখ্য যে, সে অষ্টম শ্রেণীতে টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিল। তার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

**কে. এম মাহবুব উল ইসলাম**

লালমনিরহাট

* আমাদের কনিষ্ঠা কন্যা নাজিকা তাসনিম (রিদম) ১১১৬, পশ্চিম পাইকপাড়া (লোকনাথ দীঘির উত্তর পাড়), ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সে চলতি বৎসর পাইওনিয়ার ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা থেকে বি, ডি, এস, পাশ করেছে। বর্তমানে সে ইন্টার্নশিপ করছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

**মোহাম্মদ আবু তালেব**

**ও রেহেনা বেগম**

# মুক্তিপ্রাপ্ত দলের সন্ধানে

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

মহান আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এই মানুষের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করার জন্য যুগে যুগে এই ধরাধামে হযরত আদম (আ.) হতে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) পর্যন্ত বহু নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আবার এই নবী রাসূলগণের মাধ্যমে বিভিন্ন শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত করে মানুষকে খোদাপ্রাপ্ত মানুষ হিসেবে তৈরী করার সুব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু দেখা যায় যে, এই শরীয়তও একদিন মানুষের মাঝ থেকে উঠে যায় এবং মানুষ পুণরায় গোমড়াহীর মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে থাকে। যুগে যুগে ও কালে কালে এই শরীয়তের পর খোদা তাআলা মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গীন শরীয়ত ব্যবস্থা জারী করেছিলেন, আজ থেকে প্রায় ১৫শ বছর আগে। তাও আবার আরবের মত বর্বর জাতীর মাঝে। যারা অতি খারাপ কাজে লিপ্ত থাকতো। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন অন্যায় কাজ নেই যা এই জাতির লোকেরা সে সময় না করতো।

সূরা আস্ সাজদার ৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **"ইউদাবিবরুল আম্‌রা মিনাসসামায়ে ইলাল আরদে সুম্মা ইয়া রুজু ইলাইহে ফি ইয়াওমিন কানা মিকদারুহু আল ফাছানাতিম মিম্মা তাউদ্দুন"**–অর্থাৎ তিনি পরিকল্পিতভাবে (নিজ) সিদ্ধান্ত আকাশ থেকে পৃথিবীতে প্রবর্তন করবেন। এরপর তা এরূপ এক দিনে তাঁর দিকে উঠে যাবে যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান। এই আয়াতটি ইসলামের উত্থান-পতনের ইতিহাসের একটি মহাসংকটময় ক্রান্তিকালের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। ইসলামের প্রথম ৩শ বছর নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি ও প্রগতির মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। হযরত নবী করীম (সা.)-এর একটি হাদীসে তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। **"খাইরুল কুরুনি কারনি সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম সুম্মা ইয়ায হারুল কিযব"** অর্থ–আমি যে শতাব্দীতে আছি তাই সর্বোত্তম শতাব্দী, তৎপর সন্নিহিত শতাব্দী, তৎপর সন্নিহিত শতাব্দী অত:পর মিথ্যা ছড়িয়ে পড়বে" (তিরমিযী, বুখারী-কিতাবুশ্ শাহাদাত)।

তিনশ বছরের অপ্রতিহত অগ্রগতি ও বিজয়ের পর ইসলাম অধঃমুখী হতে লাগলো। অত:পর এক হাজার বছর ধরে ইসলামের অধ:পতন ও অর্ধ:মূখীতা চলতে লাগলো। এই অধ:পতনের হাজার বছরের কথাই আলোচ্য আয়াতটিতে এভাবে বলা হয়েছে : এরপর তা এরূপ একদিনে তার দিকে উঠে যাবে যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর। মহানবী (সা.) অন্য এক হাদীসে বলেছেন "ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে যাবে এবং পারশ্য বংশীয় এক বা একাধিক ব্যক্তি একে সেখান থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনবেন (বুখারী, কিতাবুত তফসীর)।

আজ ইসলামের যে অধ:পতন হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়ে মুসলমানরা বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানী, বোমাবাজি, আত্মঘাতি হামলা ইত্যাদি ইসলাম বিরোধী কাজ দিন দিন মুসলিম সমাজে ধাবিত হচ্ছে। অথচ নবী করীম (সা.) ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

হযরত আবু ইউসুফ আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.) বলেছেন, তিনি রাসূল করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, "হে মানবজাতি! তোমরা "সালাম" বলাকে প্রসারতা দাও (গরীবদের) খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তা রক্ষা কর, যখন অন্যান্যরা নিদ্রিত থাকে তখন নামায পড়। তোমরা যদি এই কাজগুলো কর তাহলে তোমরা শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী: আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ্) এই হাদীসে যে আশার বাণী ব্যক্ত করা হয়েছে তা মুসলমানরা ভুলে গেছে। সালামের প্রচলন একেবারেই উঠে গেছে। মনে হয় সালাম পাওয়ার জন্য সবাই অপেক্ষা করে, নিজ থেকে কাউকে প্রথমে সালাম দেয়ার ইচ্ছে যেন নেই। অথচ নবী করীম (সা.)-এর দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাই, তিনি (সা.) প্রথমে সালাম দিতেন, সে ছোট হোক বা বড় হোক। নবী করীম (সা.)-এর আগে কেউ সালাম দিতে পারতো না। গরীবদের মাঝে খাবার খাওয়ানোর যে কথা বলা হয়েছে তা তো মানুষ আজ ভুলে বসে আছে। পথে ঘাটে কত গরীব মানুষ অসহায় অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে আর ধনীরা কতই না অপচয় করছে। প্রতি বছরে একটি দেশে যা অপচয় হয় তা দিয়ে হাজার হাজার গরীবের সংসার চলতে পারে।

আরও একটি বিষয় এই হাদীসে বলা হয়েছে তাহলো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। আজকের সমাজের যে অবস্থা মানুষ আত্মীয় হিসেবে পরিচয়ই দিতে চায় না। আত্মীয়দের হক মেরে খাওয়ার চিন্তায় মগ্ন। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় ইসলাম যে অধ:পতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের একজন ওয়াকফে জিন্দেগী মোয়াল্লেম মরহুম মৌলবী সলিমুল্লাহ্ তার কবিতায় লিখেছেন:–

(১)
কেন ওরে ইসলাম, আঁখি
কোণে তোর জল–
জরাজীর্ণ হ'ল কেন তব সুন্দর দেহবল?
মনে পড়ে তুমি এসেছিলে
যবে হেরা গুহা আরবের,
স্বরগে-মরতে, আকাশে বাতাসে
উঠেছিল মহাঝড়।
(২)
দীন ইসলাম আজ কান্ডারীহীন
খীলফা নাহিক তার,
হিজরী সনের তের শতাব্দী
ধীরে ধীরে হল পার।
হানাফী, শাফেয়ী, শিয়া ও সুন্নী
মালেকী ও হাম্বলী
নানাবিধ নামে বাহাত্তর
ভাগ করিয়াছে দলাদলি।

তার এই কবিতার মাঝে ইসলামের করুন চিত্র ফুটে উঠেছে। ইসলামের সুশিক্ষা আজ কোথাও দেখা যায় না। সবাই নিজ নিজ দল, মত নিয়ে ব্যস্ত। নানাবিধ বেদাতে লিপ্ত। অসামাজিক কাজ কর্মে ভরে গেছে পুরো সমাজ ব্যবস্থা। পথে ঘাটে আজ চলছে অন্যায় অত্যাচার। গ্রামে, গঞ্জে, শহরে বন্দরে, অলিতে গলিতে ব্যঙের ছাতার মত গড়ে উঠেছে যুব সমাজকে ধ্বংস করার নানা উপকরণ আর যার ফলে নানান অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে যুব সমাজ। এতে তারা ইসলামের সুশিক্ষা হতে দূরে সরে যাচ্ছে।

যেখানে ইসলামের অধ:পতন সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে–

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয় আমার উম্মতের উপরও সেসব অবস্থা আসবে যেমন বনী ইসরাঈলের উপর এসেছিল। উভয়ের মধ্যে এক জুতার সাথে অপর জুতার ন্যায় সাদৃশ্য থাকবে, এমনকি তাদের মধ্য থেকে যদি কেউ প্রকাশ্যে নিজ মাতার নিকট গমন করে থাকে তদ্রুপ আমার উম্মতের মধ্যেও এমন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে–যে ঐরূপই করবে। বনীইসরাঈল ৭২ ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছিল; আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে, তাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে কেবলমাত্র এক ফেরকা ব্যতীত। তারা (সাহাবারা) বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে ফিরকা কোনটি? তিনি বললেন, আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে সে পথে যারা থাকবে।" (তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান) অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে–হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য থেকে ফিতনা-ফ্যাসাদ উত্থাপিত হবে এবং তাদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে।" (বাইহাকী, মেশকাত) উল্লেখিত হাদীস ২টিতে আখেরী জামানায় ইসলামের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আজ ইসলামের বড়ই করুন অবস্থা আর মুসলমানগণ বড়ই দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় দিনাতিপাত করছে–এখন প্রশ্ন জাগে ইসলামের এই ক্রান্তি লগ্নে মুসলমানদের উদ্ধারের কি কোন ব্যবস্থা নাই? হ্যাঁ অবশ্যই আছে। শেষ যুগে মহান আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে পাঠিয়ে ইসলামের এই দূরাবস্থা হতে মুসলিম উম্মাহকে বাঁচাবার সুব্যবস্থা রেখেছেন। এ সম্পর্কে পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত নবী করীম (সা.)-এর কাছে বসেছিলাম, তখন সূরা জুমুআ নাযিল হল। অত:পর যখন তিনি "ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম" পড়লেন তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! এরা কারা (যারা এখনো আমাদের সাথে মিলিত হননি)? কিন্তু তিনি এর কোন উত্তর দেননি। এমনকি সে তাঁকে (সা.) দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন। বর্ণনাকারী বললো, তখন সালমান ফার্সীও আমাদের মধ্যে ছিলেন। সালমান ফার্সী (রা.)-এর কাঁধের ওপর হাত রেখে রাসূল করীম (সা.) বললেন, "ঈমান সপ্তর্ষীমন্ডলে চলে গেলেও এদের (পারশ্য বংশদ্ভুত) এক বা একাধিক ব্যক্তি সেখান থেকে তাকে নামিয়ে আনবে। (বুখারী, কিতাবুল তফসীর)।

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বর্ণনা করেছেন, "তাঁর কসম যার হাতে আমার জীবন, তোমাদের মধ্যে অবশ্যই ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হবে যিনি সুবিচারক, ন্যায় পরায়ণ হবেন। অত:পর তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন এবং শূকর বধ করবেন, যুদ্ধরহিত করবেন এবং এতো অর্থ সম্পদ বিতরণ করবেন কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না এমনকি একটি সিজদা পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত সকল বস্তু থেকে উত্তম হবে।" অত:পর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, "তোমরা এ আয়াতটি পাঠ করতে পার 'আহলে কিতাব থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ মৃত্যুর পূর্বে এর (ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যুর) উপর অবশ্যই বিশ্বাস রাখবে এবং সে কিয়ামতের দিনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)।

* হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ মরিয়মপুত্র ঈসা (আ.)-কে পাবে, সে যেন তার কাছে (আমার) সালাম পৌঁছে দেয়।" (দূররে মনসুর)।

* হযরত সাওবান (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যখন তোমরা তাকে (ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সংবাদ) পাও তখন তার হাতে বয়আত কর, যদিও তোমাদের বরফের পাহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়, কারণ তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল মাহ্‌দী।" (ইবনে মাজা)।

ইসলামের চরম অধ:পতনের পর শেষ যুগে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ঘটবে। যিনি পুনরায় ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন।

মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

কিন্তু তারা তাদের নামে নিজেদের বিষয়কে বহু খন্ডে খন্ডিত করে ফেলেছে। প্রত্যেক দল তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে অহংকার করছে। অতএব তুমি তাদেরকে অজ্ঞতায় কিছু কালের জন্য পড়ে থাকতে দাও। (সূরা আল মু'মেনুন : ৫৪-৫৫) প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র একটি ফিরকাই সত্য ও মুক্তি প্রাপ্ত হবে। এই বিষয়ের মীমাংসা স্বয়ং নবী করীম (সা.) করে দিয়েছেন এবং এই সত্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত ফিরকাকে চিনবার জন্য এই মাপকাঠিও উম্মতের হাতে তুলে দিয়েছেন–যে ফিরকাহ্ নবী করীম (সা.) ও তাঁর সাহাবাগণের পথে পরিচালিত হবে এবং তাদের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবে কেবল সেই ফিরকাহ্‌ই সত্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। সাহাবাদের পথ ও কার্যাবলীর দৃষ্টান্ত এই ছিল যে, যতদিন নবী করীম (সা.) সাহাবাদের মধ্যে ছিলেন ততদিন তারা তাঁকে সর্বান্তকরণে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করে গিয়েছেন এবং হুযূর আকদাস (সা.)-এর ইন্তেকালের পরক্ষণেই তাঁদের মধ্যে–

খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার মাধ্যমে সাহাবাগণ একতা শৃঙ্খলা ও পারস্পারিক মহব্বতের ভিত্তিতে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং খলীফার নেতৃত্বাধীনে তাঁরা পারশ্য, সিরিয়া, ইরাক, ও মিশর প্রভৃতি দেশ জয় করে ইসলামী পতাকার ছায়াতলে এনে এক স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছিলেন। তাদের একটি কেন্দ্র ছিল। তাদের বায়তুল মাল ছিল। খলীফাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য মজলিসে শূরা (পরামর্শ সভা) ছিল। তাদের মধ্যে পরম ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল এবং একে অপরের জন্য প্রিয় হতে প্রিয়তর বস্তু এমনকি জীবন পর্যন্ত কুরবান করতেন। তারা ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকতেন।

বর্তমান যুগে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এ জামা'তের আহমদী ছাড়া কোন ফিরকার মধ্যে সাহাবাদের এই গুণাবলীর সমাবেশ আছে বলে কেউ দাবী করতে পারে না। সম্মানিত পাঠক বৃন্দের জন্য এস্থলে চিন্তার খোরাক রয়েছে। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনে এই অধ:পতনের গতি রুদ্ধ হয়েছে এবং ইসলামের নব জাগরণ পুণরায় আরম্ভ হয়েছে।

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ইমাম মাহদী (আ.)-কে মান্য না করলে আল্লাহ্ তাআলা এবং হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর আদেশ অমান্য করার অপরাধে অপরাধী হতে হবে এবং সত্য ফিরকাহ্ অনুসরণ না করলে আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগ করতে হবে। মহান আল্লাহ্ তাআলা পথহারা মানুষকে সত্য বুঝার ও সত্য গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

# আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমেই ইসলামের বিশ্ববিজয়

মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (এবং) আমার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুস্কৃতকারী" (সূরা আন্ নূর : ৫৬) মহান আল্লাহ্ তাআলা যেদিন হযরত আদম (আ.)-কে স্বঘোষিত খলীফা মনোনয়ন দিয়ে বিশ্ব ভ্রমন্ডে পদার্পণ করিয়েছিলেন, সেই থেকে এই পৃথিবী ও মানবজাতি সময় ও প্রয়োজন অনুসারে কখনও খলীফা শূন্য হয়নি বা করা হয়নি। আল্লাহ্ তাআলা সূরা বাকারাতে এই বিষয়টিকে চিরকালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাখার লক্ষ্যে, ব্যক্ত করলেন, "ইন্নি জায়েলুন ফিল আরদে খলীফা অর্থাৎ –নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি। তাইতো খোদা তাআলা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা রূপে তিনি পৃথিবীর বুকে তারই পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে কাউকে না কাউকে নিয়োগ করে যাচ্ছেন, আর এই শৃঙ্খল কাল কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ তাআলা। হযরত মহানবী (সা.)-এর হাদীস গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা এই ধারায় অসংখ্য পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক পয়গম্বরের তিরোহিত হওয়ার পর, তাঁর মিশনকে কার্যকর রাখার লক্ষ্যে ঐশী হস্তে একত্রিত করার নিমিত্তে আগত নবীর স্থলবর্তী খলীফাগণ তাঁর জামা'তের মাঝে জারি রেখেছেন এবং তাঁর বাণীগুলিকে তাঁর জামা'তের মাঝে ও পৃথিবীর মানবতার জীবনে বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছেন।

পরিপূর্ণ গ্রন্থ আল কুরআন পাঠ করলে পরিস্কারভাবেই জানা যায় যে খলীফা দুই প্রকার হয়ে থাকে যেমন সূরা বাকারাতে নবীকে খলীফা বলা হয়েছে অপরদিকে সূরা আন্ নূরে বলা হয়েছে নবীর আগমনের পর সৎকর্মশীল মু'মিনের মধ্যে খলীফা বানানোর কথা। (ক) খিলাফতের প্রধান ও প্রথম প্রকার হলো নবী-খলীফাগণ, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ সহকারে পৃথিবীতে নবীও খলীফারূপে প্রেরণ করেন। (খ) দ্বিতীয় ধরনের খলীফা হলেন তাঁরা, যাঁরা নবীর ওফাতের পর নবীর স্থলবর্তী হয়ে নবীর কাছে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আগত দায়দায়িত্ব, আদর্শ ও কর্মসূচীকে রূহানী ও জাগতিকভাবে সংরক্ষণ করেন এবং নিবেদিত চিত্তে আল্লাহ্‌র সরাসরি সাহায্যে ও মু'মিনদের সহায়তায় বাস্তবায়ন করেন। সরওয়ারে কায়নাতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) হলেন সমস্ত নবীর উপরে নবী, বিশ্বনবী খাতামান নাবীঈন। তাঁরই ফলশ্রুতিতে তাঁর উম্মতের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার সর্বাপেক্ষা বেশী অনুগ্রহের আলোচনা পবিত্র কুরআনের সূরা আন্ নূর সহ সূরা মায়েদা, সূরা আহযাব, সূরা কাওসার ইত্যাদি সূরায় ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা মায়েদার মধ্যে বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম। আর আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম।" সূরা আন নূর এর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে বাধ্য যে, সূরা মায়েদার আয়াত মাফিক সবগুলিই বাস্তবায়িত হয়েছে। হযরত রাসূলে মকবুল (সা.)-এর তিরোধানের পরে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), হযরত ওমর ফারুক (রা.), হযরত ওসমান গনি (রা.), হযরত আলী (রা.), একের পর এক খলীফা মনোনীত হয়েছে। কুরআনের বাণী এমন এক জিন্দা বাণী যার পূর্ণতার জন্য শর্তের কোন পরওয়া করে না আর আগামীতেও করবে না আর এটিই একমাত্র পরিপূর্ণ কিতাব ও শরিয়ত।

**খিলাফত ও বাদশাহাত ভিন্ন জগত**

খলীফা বা খিলাফত নিয়ে কথা বলতে গেলে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হয় তা হল 'বাদশাহাত' বা 'রাজতন্ত্র' আঁ-হযরত (সা.)-এর তিরোধানের পর একের পর এক আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত খলীফা যখন নির্বাচিত হয়ে মুসলমানদের ঐশী মদদপুষ্ঠ নেতৃত্ব দিচ্ছেলেন, তখনই কিছু দিন যেতে না যেতে অত্যন্ত দু:খের সাথে ঘৃণা ভরে বলতে হচ্ছে উক্ত রাশেদ খলীফাগণের পরে খিলাফতের জামার আস্তিনে দুনিয়াবী লোভ লিপ্সা প্রবেশ করল। ঐশী হস্তের ও সমর্থনের নির্বাচন বর্জন করে, বংশগত যা ঐশী জগতের জন্য অত্যন্ত জঘন্য বিষয় বাদশাহাত তথা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত খিলাফত! মুসলমানদের মধ্যে স্থান করে নিল। তার সাথে সাথে জীবন্ত ঈমান ও 'সজিব' আমলে খারাবী প্রবেশ করতে শুরু করল। মুসলিম ঐক্যে ফাটল দেখা দিল এবং অন্তবিরোধ আস্তে আস্তে দানা বাধা শুরু করে দিল। আর খিলাফতের মধ্যেও বিভক্তি দেখা দিল এবং হয়েও গেল। যেমন বিভক্তি ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে যদিও খিলাফত চলতে থাকল বটে, কিন্তু ঐশী খিলাফতের আধ্যাত্মিক শক্তি ও খোদার সেই মদদ যা তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত দান করেছিলেন তা ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ল। মহান আল্লাহ্ তাআলা পূর্বেই জানতেন যে, খিলাফতের গলা কাটা হবে তাই তিনি পবিত্র কুরআনে বর্ণনা দিলেন–ইন্না নাহনু নাযযালনাজ যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লা হাফেজুন" অর্থাৎ 'হে নমরুদ, ফেরাউনের দল বল এবং আবু জাহলের সহচররা তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের ইচ্ছা বা পরিকল্পনা কখনও সফল হবে না, আমিও আমার নবীর (সা.) ইচ্ছাই সফল হবে। হাদীস গ্রন্থের আবু দাউদের ২য় খন্ডে একটি বিখ্যাত হাদীস আছে যেখানে সূরা আল হিজরের উক্ত আয়াতকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করেছে যে, নিশ্চয় প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য ধর্মকে সঞ্জিবীত করতে মোজাদ্দেদগণ আগমন করবেন। আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহান ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক আধ্যাত্মিক শক্তি ও জ্যোতি সম্পন্ন প্রতিশ্রুত মোজদ্দেদগণ প্রত্যেক শতাব্দীতে আগমন করে, ইসলামের আধ্যাত্মিক সীমান্ত যথা সম্ভব হেফাযত করতে থাকলেন। অপরদিকে পবিত্র খিলাফতের উপর আর প্রবল গতিতে অন্ধকার ও পার্থিবতার পঙ্কিলতা ছেয়ে যেতে থাকল। সব চাইতে লক্ষণীয় ও মজার বিষয় হল হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন উক্ত রঙ্গে পাপ ও স্বার্থবাদি খিলাফত তুরস্ক সাম্রাজ্য আক্রান্ত হয়ে তুর্কী সম্রাট সুলতান আব্দুল হামিদের তথাকার খিলাফত যখন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল তখনই সারা মুসলিম বিশ্বে ঐ খিলাফতই রক্ষার জন্য মুসলিমরা এক হওয়ার বিশ্ব জোড়া আওয়াজ ও আন্দোলনের ডাক দিল।

খলীফা আব্দুল হামীদের খিলাফত বিপন্নকে কেন্দ্র করে রক্ষার যে আন্দোলন মুসলিম বিশ্বে দেখা দিয়েছিল তা থেকে প্রমাণিত যে ইসলাম ও মোহাম্মদী শরীয়ত খিলাফত ও খলীফা বিহীন থাকতে পারে না, যার উল্লেখ এই প্রবন্ধের শুরুতে সূরা আন নূরে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

**ইসলামে খিলাফতের নিবিড় সম্পর্ক**

ইসলামের সাথে ঐশী খিলাফতের যে, কি নিগুঢ় অভিন্নতা ও একাত্মতা রয়েছে তা মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মুসলমানদের খলীফা হয়ে তা প্রমাণ করেছেন, তেমনি পবিত্র কুরআন পাঠ করলে তা আরও পরিস্কারভাবে উপলব্ধি করা সহজ হয়। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে সূরা আস্ সাজদাতে উল্লেখ করেন–"তিনি পরিকল্পিতভাবে নিজ সিদ্ধান্ত আকাশ থেকে পৃথিবীতে প্রবর্তন করবেন। এরপর তা এরূপ এক দিনে তাঁর দিকে উঠে যাবে যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।"

উক্ত আয়াত তো আছেই অপরদিকে অনেক এমন আয়াত দ্বারা ও হাদীস দ্বারা ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, এখান থেকেই ইসলামের পুনরুত্থানের নতুন জয়যাত্রা শুরু হবে, নতুনভাবে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের মাধ্যমে। উক্ত আয়াতের আলোচনা করলে এতটুকু জানা যায় যে, ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সময় লেগেছিল তিনশত বছর। এরপর ক্রমাবনতির সূচনা হয় এবং এক হাজার বছরের মাথায় অর্থাৎ মোট ১৩০০ বছর পর চরম পতন ঘটে। একটি জীবন্ত প্রমাণ খিলাফতের পতনই এর বাহ্যিক রূপ।

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত এবং আঁ-হযরত (সা.)-এর বহু হাদীস যেমন ইসলামের এই চরম অধ:পতনকে চিহ্নিত করে, তেমনি এমন অনেক কুরআনী আয়াত ও হাদীস এই দু:সময়ে ইসলামের পুনরুজ্জীবনকল্পে আধ্যাত্মিক উপায়ে ও ব্যবস্থায় ইসলামী খিলাফতের নব-সূচনায় সুদৃঢ় আশ্বাস দান করে। কুরআন ও হাদীস পাঠে পরিস্কার বুঝা যায়, খলীফা বা খিলাফত ছাড়া মুসলমানদের ঐক্য এবং ইসলামের বিজয়কে চিন্তা করা যায় না।

**ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর মাধ্যমে পুণ:খিলাফত কায়েম**

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও আহমদ বায়হাকীর হাদীস "খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুওয়াত, অর্থাৎ নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত কায়েম হবে। খোদা তাআলার ফজলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপরোক্ত হাদীসে প্রতিশ্রুত সেই খিলাফতই, খলীফাতুল্লাহেল মাহ্‌দী তথা প্রতিশ্রুত ঈসা নবীউল্লাহ্ এসে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আহ্‌মদ বায়হাকীর উক্ত হাদীস মোতাবেক মহানবী (সা.)-এর সকল ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর সবটাই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। মুসলিম বিশ্বে খিলাফত বিহীন বিশ্ব অচলাবস্থা প্রমাণ করে যে খিলাফতের জন্য যে ধরণের ঈমান-আমল ও তাক্ওয়া-সৎকর্মশীলতা প্রয়োজন ছিল তা কিছুই ছিল না। ঐশী খিলাফতের যে শক্তি সামর্থ তা সবটুকুই বিলীন ছিল, বাকী ছিল বাহ্যিকতা। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলে গেছেন, "এই খিলাফতের শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, কেননা এটা আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের দ্বিতীয় বিকাশ" কাল কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে বলে যে খিলাফতের শৃঙ্খল ধারা চালু হয়েছে এতে যারা মনে প্রাণে বরণ করে নিয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন পূর্বক ইসলামের বিশ্ব বিজয়ী প্রচার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে, তারাই যে আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিত রাসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর নির্দেশ মোতাবেক এই কাজ করছেন তাঁর দলিল যেমন অসংখ্য মজুদ তেমনি দ্বীন-দুনিয়ার কামিয়াবীর জন্য কোন সন্দেহ নাই। আল্লাহ্ তাআলার সরাসরি ফজলে আজ এই আধ্যাত্মিক আন্দোলন ধীরে ধীরে পৃথিবীর ১৯৮টি দেশে যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত তেমনি সমস্ত পৃথিবীর সকল জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দলে দলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এই ঐশী খিলাফতের অধিনস্ত হয়ে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছে।

এই ঐশী খিলাফতের অধীনস্ত থেকে তারা সকল ধরণের ত্যাগ-তিতিক্ষা, দুঃখ-কষ্ট যুলুম-অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছে এই বলে যে এটিই আধ্যাত্মিক পদমর্যাদার পথ যা নবীর জামা'তের জন্য হয়ে থাকে। তারা এটাও বিশ্বাস করেন যে, আমরা এই খিলাফতের অধিনস্ত থেকেই পারলৌকিক কল্যাণ ও ইহলৌকিক কল্যাণ লাভ করছি। ধর্ম ও ধর্মের ইতিহাস থেকে জ্ঞাত এবং কুরআন ও হাদীস থেকে স্বপ্রমাণিত যে, ঐশী খিলাফত ছাড়া কোন জাতি কোন কালেই উভয় জগতের মহা কল্যাণে ভূষিত হয়নি তেমনি আজও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যগণ এই বিশ্বাসের উপর কায়েম থেকে সারা জগতের মানবজাতিকে এই মহা আহ্বানই করছে যে খলীফা ও খিলাফত ছাড়া অবক্ষয় মুক্ত জাতি বা পৃথিবী তা আশা করা অসম্ভব। যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি সৃষ্টির শুরু থেকে তাঁর প্রিয়দের ছাড়া কোন কালেই সৃষ্টির সঙ্গে সাক্ষাত বা যোগাযোগ করেন নি, তাই হে সমস্ত পৃথিবীর মানবজাতি! আজ তোমরা কেমন করে সৃষ্টিকর্তার সেই অমোঘ নীতিকে ভুলে গিয়ে এখন তা পরিবর্তন করতে চাচ্ছ বা হবে।

খিলাফতের নেতৃত্বেই হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর পতাকাতলে ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের এই প্রতিশ্রুত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে, এক জাতিতে পরিণত হবে যার জয় যাত্রা অতি দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসরমান। সেদিন বেশি দূরে নয় বা আর দেড়ি নেই যে এক আল্লাহ্ এক রাসূল (সা.) এবং একই উম্মত তখন সারা বিশ্বে সসম্মানে বিরাজ করবে। নবী আগমন করে একটি ঐশী জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করে জামা'তের সদস্যদেরকে সৎ কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নেকট্য প্রাপ্ত করে তুলেন। নবী যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন ধর্মের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শসমূহকে স্বীয় জীবনে প্রাণপণে রূপায়িত করে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং নিজের শিষ্যমন্ডলীকে এক উচ্চ মার্গে উন্নীত করে বিদায় নেন। নবীর তিরোহিত হবার পর এই উচ্চ স্থানীয় শিষ্যরা আল্লাহ্ ও নবীর ফরমান মোতাবেক সমবেত হয়ে একজনকে খলীফার পদে নির্বাচিত করে তাঁর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ইহাকে ইসলামী পরিভাষায় 'বয়আত' বলা হয়। বয়আত অর্থ আল্লাহ্‌র জন্য তাঁর ইচ্ছায় তাঁর প্রেরিত নবীর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে বিক্রি করে দেওয়া অথবা তাঁর খলীফার কাছে নিজেকে বিক্রি করা।

আল্লাহ্‌র প্রেরিতগণ সৃষ্টির জন্য দয়াদ্র-চিত্ত হন, এমন কি এক স্নেহময়ী মাতার তুলনায় উম্মতের প্রতি তাঁদের দরদ বা ভালবাসা বেশি থাকে। উম্মতগণ ঐ রূপ করে তখন পার্থিব ও অপার্থিব কল্যাণ তাদের জন্য অজস্র ধারায় আসমান থেকে নেমে আসে। বাহ্যিকভাবে, সৎকর্মশীল ধার্মিক নির্বাচক মন্ডলীর দ্বারা খলীফা নির্বাচিত হলেও আসলে কিন্তু আল্লাহ তাআলাই ঐ নির্বাচক মন্ডলীর মনে প্রেরণা সৃষ্টি করে দেন, যাতে মু'মিনদের জামা'তের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তি খলীফা হন যাঁর মধ্যে ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়াবলীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাসমূহ গুণাবলী রয়েছে, অন্য শব্দে বা মূল কথা বলতে গেলে এভাবে বলা যায়, হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ পরিপূর্ণ রূপে রয়ছে।

আর এভাবে সূরা নূরে খিলাফতের ওয়াদা আল্লাহ্ তাআলা পরোক্ষভাবে সম্পাদন করেন। পরোক্ষ খিলাফত, কায়েম হওয়ার পরপরই মু'মিনদের উপর খলীফার জন্য আধ্যাত্মিক দায়িত্ব, কর্তব্য বর্তায় এবং সেই অনুযায়ী কর্তৃত্বও জন্মায়। মু'মিনদের জামা'তের প্রত্যেক সদস্য/সদস্যা এর উপর বিশ্বাস রাখেন যে, আল্লাহ্‌র খলীফা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে নির্বাচিত হয় তাই খলীফা নিজে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি তাই তাঁর আদেশ-নিষেধ মানার মধ্যেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আজ এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যে ঐশী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই খিলাফতকে মানার মধ্যেই পৃথিবীর মুক্তি নিহিত রয়েছে।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে পুণরায় খিলাফত কায়েম হয়েছে, সেই খিলাফতের নেতৃত্বেই ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মের উপর বিশ্ব বিজয় লাভ করবে বলে পবিত্র কুরআনে অসংখ্যা জায়গাতে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এই জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতাকে অজস্র ঐশী সংবাদের মাধ্যমে জানিয়েছেন তোমার মাধ্যমেই আজকের মানবতার মুক্তি নিহিত, তোমার তিরোধানের পরে দ্বিতীয় কুদরত প্রকাশিত হবে। আর তা থেকে দুনিয়ার বাদশাহগণ কল্যাণ তালাশ করবে বা লাভ করবে।

আমাদের খোদার দরবারে হাজারও আহাজারি, হে খোদা তোমার এই ঐশী ইচ্ছাকে জগতের মানুষকে বুঝার শক্তি ও সামর্থ দান কর, আমীন।

জিকরে খায়ের

# স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল : প্রিয় ভ্রাতা মুহাম্মদ ইয়ামিন স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

সৈয়দ মমতাজ আহমদ

**"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মদীন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ ওয়া বারেক ওয়া সাল্লাম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"**

ইসলামে মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন **"...তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাদের গুণের কথা, ভালো কথা বল।"** ভালো কাজের প্রচার করা উচিত। অতএব আমরা সকলের ভালো কথা ও গুণের কথা বলি–ভাল কর্মের প্রচলন করি। যাতে করে আমাদের নব প্রজন্ম উৎসাহিত হয়। মানুষের জীবনে নিজের অনুভূতির সবটাই এক সময়ের প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। এক্ষণে এই মুহূর্তে আমার নিজের অনুভূতি এই যে মরহুম মুহাম্মদ ইয়ামিন সাহেবের অবদান কখনও অস্বীকার করা যাবে না। তিনি ছিলেন দানশীল ও মানবদরদী।

বাংলাদেশে জামা'তের প্রকাশনার খেদমতে ও বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে তিনি অনন্য সাধারণ অবদান রেখেছেন। আত্মীয়তা সূত্রে তিনি আমার ফুফাত ভাই ছিলেন; যখনই দেখা হতো তাঁর ভালোবাসায় সিক্ত হতাম। আমাদের তরুণ প্রজন্মই বাংলাদেশে আহমদীয়াতের ভবিষ্যত তাদের অনেকেই হয়তোবা জানেন না যে, মুহাম্মদ ইয়ামিন সাহেব ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান হিসেবে যথার্থই ঐতিহ্য বহন করেছেন। বাংলাদেশ আহমদীয়া জামা'তে খেদমতের ক্ষেত্রে তিনি এক বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, আমাদের জামা'তের প্রখ্যাত কৃতী সদর মুরব্বী মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব স্মরণে তাঁর উত্তরসূরীরা একটি জীবনালক্ষ্যে Profile in Commitment Memoir/স্মৃতি কথা] বই ২০০২ ইং সালে প্রকাশ করেন। উক্ত Memoir /স্মৃতি কথা সম্বলিত বইটিতে প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর সাহেবান সহ জামা'তের বিশিষ্টজনেরা কীর্তিমান মোবাল্লেগ মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব (মরহুম)-এর

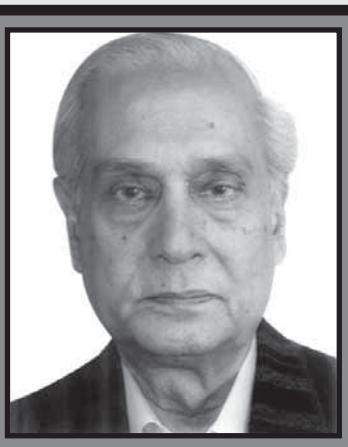

মুহাম্মদ ইয়ামিন
জন্ম : ১৯৩৩, মৃত্যু : ২০১১

প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন। তাঁদের অনেকের উক্ত স্মৃতিচারণে কথা প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইয়ামিন সাহেবের কথাও উঠে এসেছে।

প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব (মরহুম) লিখেছেন ".....১৯৬৮ জুন মাসে মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবকে ময়মনসিংহ জামা'তে বদলী করা হল। তাঁকে আমার বাসায় থাকতে দিলাম। তিনি ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহে ছিলেন। এরপর তাঁকে ইসলামাবাদ বদলী করা হয়।

উল্লেখ্য যে ১৯৬৮ সাল থেকে মধ্যে মধ্যে তিনি ময়মনসিংহ আসতেন। দুই চারদিন থেকে আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে যেতেন। ময়মনসিংহে থাকাকালে আমি দেখলাম তাঁর কাছে বহু মূল্যবান পত্র-পত্রিকার কাটিং এবং তাঁকে বললাম, আপনি এসব একত্রিত করে বই লিখুন। তিনি বললেন, আমি যে ভালো বাংলা জানি না। সারা জীবন উর্দু, আরবী পড়েছি। বাংলায় লেখাপড়া করিনি। শিক্ষা জীবন কেটেছে পাঞ্জাবে। আমি বললাম, 'আপনি শুরু করেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব সাধ্যমত'। প্রথমে তাঁকে তাঁর বুযুর্গ পিতার প্রখ্যাত 'জজবাতুল হক' পুস্তকটি অনুবাদ করতে দিলাম।

তিনি অনুবাদ করলেন। আমি চলতি এবং সাধু ভাষায় কোন্দল মেটাবার চেষ্টা করলাম। বই তৈরী হয়ে গেল। আমি ঢাকায় গিয়ে তাঁর ভাগিনা জনাব ইয়ামীন সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম, আপনার নানা মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের 'জজবাতুল হক' বইটি আপনার মামা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব অনুবাদ করেছেন। এখন এটি ছাপার দরকার। আপনি অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন। তিনি অর্থ দিলেন। ময়মনসিংহ থেকে বইটি ছাপা হল। প্রুফ আমি নিজেই দেখলাম। শুরু হলো মওলানা সাহেবের কলম যুদ্ধ। আমি বলাম, আপনার কাছে যেসব ভান্ডার আছে তা একত্রিত করে বই লিখুন তিনি লিখতে শুরু করলেন। বেরিয়ে এল, 'আহমদীয়াত' এবং 'সীরাতে সুলতানুল কলম'। জনাব ইয়ামিন সাহেবের কাছে নিয়ে এগুলির ছাপার ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহিত করলাম।

'ফতেহ ইসলাম' বইটি তাঁকে পড়তে দিয়ে বললাম, আপনি প্রকাশনা কাজে সাহায্য করে মসীহ্ মাওউদের স্বপ্ন সফল করুন। তিনি অনুপ্রাণিত হলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি বহু পুস্তক প্রকাশ করেছেন, বিতরণ করেছেন বিনা পয়সায় দেশে এবং বিদেশে। আল্লাহ্ উত্তম প্রতিফল দান করুন, আমীন। উল্লেখ্য যে, তিনি নাম প্রকাশে বিমুখ। তবুও ইতিহাসের প্রয়োজনে তাঁর নাম এসে গেল।".....

উক্ত Memoir/স্মৃতি কথা বইটিতে তৎকালীন ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ মোহতরম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব লিখেছেন....."মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব যখনই আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠেন তখনই অনেক কিছু তার সাথে জট পাকিয়ে যায় যেমন আহমদীয়াত, সমাজের সুধী মহলের সাথে তার অবাধ বিচরণ সর্বোপরি তার স্নেহধন্য ভাগ্নে মোহাম্মদ ইয়ামিন সাহেব ও তার পরিবার।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মূলত: প্রকাশনাকে কেন্দ্র

করেই নানাজী ও আমি শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ইয়ামিন সাহেবের আমন্ত্রণে প্রায়শই তাঁর বাসায় মিলিত হতাম। আহমদীয়াতে তবলীগ তথা বাংলাদেশের সর্বত্র এ সত্যের আলো কিভাবে ছড়িয়ে দেয়া যায় গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ঐ একটাই। শুধু কি তাই! তিনি তাঁর অ-আহমদী স্ত্রীর সাথেও এসব বিষয় নিয়ে পরামর্শ করতেন। এ অবস্থার মাঝে কোন একদিন নানাজী ও নানাজানের মাধ্যমে ইয়ামিন সাহেবের স্ত্রী স্বত:স্ফূর্তভাবে আনন্দঘন পরিবেশে ইমাম মাহদী (আ.)-এর বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন। এ বয়আতের ঘটনা ও শুভ মুহূর্তটি ভাই ইয়ামিন এবং নানাজীর জীবনে বলতে গেলে এক ব্যতিক্রমী আনন্দ ও অভূতপূর্ব খুশীর বন্যা বইয়ে দেয়।

কারণ ইয়ামিন সাহেব বলতেন ধর্ম কারো উপর চাপিয়ে দেয়ার বিষয় নয় আর তিনিও তাঁর স্ত্রীর সাথে আহমদীয়াতের বিষয় নিয়ে কখনো বাড়াবাড়ি করেন নি, কোন মতামতও তাঁর উপর চাপিয়ে দিতেন না। তাই এ বয়আত তার কাছে ছিল ভিন্ন অনভূতির ও পরম খুশীর। আমার স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এ বিষয়ে উপসংহারে একটু বলতেই হয় যে, বিংশ শতকের শেষ প্রান্তে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় মোল্লাদের আন্দোলন পুনরায় মাথাচারা দিয়ে উঠার রিপোর্ট হুযূর (আই.)-এর নিকট পাঠালে তিনি বাংলাদেশ জামা'তকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় 'জজবাতুল হক' বইটি ব্যাপকভাবে বিতরণের নির্দেশ দেন।

নানাজী পূর্বেই জজবাতুল হক পুস্তকটি তাঁর স্বনামধন্য ভাগ্নে ইয়ামিন সাহেবের সহযোগিতায় জামা'তকে তোহ্‌ফা স্বরূপ পেশ করেছিলেন বিধায় আমরা সময়পোযোগী ব্যবস্থা নিতে সচেষ্ট হই। একইভাবে খাকসারের উপর তবলীগ ও লাইব্রেরী দেখাশুনার দায়িত্ব থাকায় যখনই কেহ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী সম্পর্কে জানতে চান আমরা মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব রচিত 'সীরাত সুলতানুল কলম' গ্রন্থটি পরিবেশন করে থাকি।

এছাড়া তবলীগি কাজে আমরা প্রাথমিকভাবে ছোট খাট লিফলেট ফোল্ডার দিয়ে থাকি কিন্তু যখন কোন উৎসাহী সত্যানুসন্ধিৎসু জেরে-তবলীগ ব্যক্তি আরো গভীরভাবে জানতে চায় আর তখনই আমরা তার হাতে তুলে দিয়ে থাকি নানাজীর বিশেষ সংকলন গ্রন্থ "আহমদীয়াত".....

[বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার সুবাদে মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব হলেন জনাব এ.বি.এম.এ সাত্তার সাহেবের নানা শ্বশুর, সেই সুবাদে সাত্তার সাহেবের ভগ্নিপতি জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেবও মওলানা সাহেবকে নানা বলে ডাকতেন।]

জামা'তের বিশিষ্ট বুযুর্গ আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব (মরহুম) উক্ত 'Memoir /স্মৃতি কথা' সম্বলিত বইটিতে মরহুম মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর স্মৃতিচারণে এক পর্যায়ে লিখেছেন যে,....."তাঁর একটি বিশেষ কৃতিত্বের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। মোহতরম মোহাম্মদ ইয়ামিন সাহেবের স্ত্রীর আহমদীয়াত কবুল ও তাঁর জামা'তের প্রতি প্রসারিত হাতের উদ্দীপনা যোগাতে মরহুমের অবদান যে কত বিরাট তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।".....

মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব (মরহুম) তাঁর লিখিত বহুল সমাদৃত 'সীরাতে সুলতানুল কলম' [হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জীবন চরিত] পুস্তকে মিনারাতুল মসীহ্ অধ্যায়ের এক জায়গায় উল্লেখ করেন যে,....."এই শ্বেতমিনার তৈরী হওয়ার ২৫/২৬ বৎসর পর কাদিয়ানের আশে পাশের বহু কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়ায় সেই শ্বেত মিনারের উপর তার প্রতিক্রিয়া হয় এবং ধীরে ধীরে উজ্জ্বল শ্বেত-মিনারটি বিষাক্ত ধোঁয়ায় বিবর্ণ হওয়ার কারণে মিনারটির সৌন্দর্য ম্লান করে ফেলে।

তখন কাদিয়ান জামা'তের আমীর সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব ভারতবর্ষের বড় বড় প্রকৌশলী দ্বারা এর কারণ সম্পর্কে পরীক্ষা করান এবং পরামর্শ নেন। প্রকৌশলীগণ মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পূর্বের লাগানো শ্বেত মার্বেল পাথরগুলো বদলিয়ে নূতন শ্বেত মার্বেল পাথর লাগানো ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই যা বহু ব্যয় সাপেক্ষে।

এ প্রসঙ্গে আমার স্নেহাস্পদ ভাগিনা মোহাম্মদ ইয়ামিন ইতোপূর্বে খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের নিকট স্পেনের মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু স্পেনের মসজিদ নির্মাণের টাকা-পয়সা ইতোমধ্যে যোগাড় হয়ে যাওয়ায় খলীফাতুল মসীহ্ সালেস মোহাম্মদ ইয়ামিন সাহেবকে বলেন যে, "দীনি খেদমতের আকাঙ্খা থাকলে এবং তিনি ইচ্ছা করলে 'কাদিয়ানের মিনারাতুল মসীহ্-এর শ্বেত মার্বেল পাথর বদলানো এবং তার সংস্কার কার্য সমাধা করতে পারেন।"

তখন হযরত সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে মিনারাতুল মসীহ্-এর পুরাতন শ্বেত মার্বেল পাথর বদলিয়ে নূতন শ্বেত মার্বেল পাথর লাগানো হয় এবং শ্বেত মিনারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হয়। মিনারাতুল মসীহ্ -এর শ্বেত পাথর বদলানো এবং সংস্কারের যাবতীয় ব্যয়ভার মোহাম্মদ ইয়ামিন একাই বহন করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর কুরবানী কবুল করুন এবং তাকে আগামীতেও আরো অধিক মাত্রায় আমাদের জামা'ত ও ইসলামের খেদমত করার সুযোগ দান করুন, আমীন।".....

জন্ম মৃত্যু অমোঘ সত্য। মৃত্যুর পর পরই পৃথিবীর সকল হিসাব নিকাশের বাইরে চলে যায় মানুষ। তবে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা ও রূহের মাগফিরাত কামনা করা ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা। যারা এ পৃথিবীতে আছে তাদের প্রত্যেকেই নি:শেষ হয়ে যাবে। একমাত্র তোমার মহাপ্রতাপশালী ও মহামান্বিত প্রভু-প্রতিপলকই অবশিষ্ট থাকবেন।

যাই হোক পরিশেষে মহান আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দোয়া করি - 'হে রাব্বুল আলামীন! আমাদের প্রিয় ইয়ামিন ভাইকে বেহেশ্‌তের উচ্চ মোকাম দান কর এবং তাঁর গুণাবলী তাঁর ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যেও যেন সম্প্রসারিত হয়।

May Allah Shower
His choicest blessing upon him
And envelop him in His mercy.

[লেখক : **মরহুমের মামাতো ভাই**]

## শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তাহেরাবাদের আনসারুল্লাহ্‌র সদস্য জনাব মোহাম্মদ লোকমান হোসেন মন্ডল গত ১৬/০৫/২০১১ তারিখ বিকাল ৪-৪৫ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। ১৯৭৫ সালে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। মরহুম গত তিন বছর যাবত খাদ্যনালীর ক্যান্সারে ভুগছিলেন।

মরহুমের পুত্র জানাযার নামায পড়ান এবং ৩০০/৪০০ লোক জানাযার নামাযে (আহমদী, অ-আহমদী) অংশগ্রহণ করেন। তার রূহের মাগফেরাতের জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

**মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন**

নবীনদের পাতা

# আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন– আত্মোপলব্ধির দিশা

শিল্প সংস্কৃতির সূচনা ঠিক কোন দিন হয়েছিল সেটি তো নির্দিষ্ট করে জানা যায় না। কিন্তু সংস্কৃতি যে বর্তমানে মানুষের মাঝে দারুন জায়গা করে নিয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রাচীন নৃত্য কিংবা শব্দের সাথে শব্দ মিলিয়ে তাতে সুর প্রদান করে সংগীত রচনা করা শুরু হয়েছে সেই সুদূর অতীতে। তার সাথে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র সংযোজন করে তাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টাও অভিনব নয় বরং অনেক পুরনো।

শিল্প সংস্কৃতির আবির্ভাব, সংযোজন ও এর প্রেক্ষাপট আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আলোচনার প্রেক্ষিতে নিজের অতি সামান্য ধারণাটা উপস্থাপন করা আবশ্যক। যে বিষয়টি মনকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয় তা হল এর প্রভাব। বলতে বাধা নাই শিল্প সংস্কৃতির আধুনিকীকরণের সাথে সাথে মানুষের মনেরও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল বা অনুন্নত রাষ্ট্রের তুলনায় পশ্চিমা ইউরোপীয় সমাজে এর চর্চা, প্রভাব সবচেয়ে বেশি। পশ্চিমা বিশ্বে এর প্রভাব যেহেতু স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়নি তাই এর বাস্তব প্রতিফল একেবারে সঠিকভাবে অনুধাবন তো আমি করতে পারিনি। কিন্তু আপন দেশ ও জাতিসত্তা নিয়ে যতটুকু উপলব্ধি করার সুযোগ আছে তা কখনই ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করেনি।

যাই হোক, পশ্চিমা সমাজের অনুকরণে আমরা এখন সংস্কৃতির ডানা যুক্ত প্লেনে করে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছি। সেই প্লেনের ফোর্স হিসেবে কাজ করছেন পপ তারকারা। অবশ্য এখানে একটু যোগ করতে চাই, তাদের আবার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন নামি দামী কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তারা তো তাদের কার্য সিদ্ধি করছে, কিন্তু বিনিময়ে আমরা কি পাচ্ছি তা ভেবে দেখার দরকার আছে। নিজ অঞ্চলের জাতিগত আচার ছেড়ে তারা আবার কখনও কখনও আহ্বান জানান পার্শ্ববর্তী সংস্কৃতি সাধকদের। তারা সেখান থেকে এসে আরো কিছু নোংরামি আমাদের উপহার দিয়ে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে আমাদের প্রজন্ম ও চিরাচরিত রীতিনীতি। প্রাথমিক ভাবে সবচেয়ে বেশি শঙ্কায় পড়ে যাচ্ছে আগামী প্রজন্ম। কেননা তারাই কিনা আগামী সমাজের ধারক ও বাহক। কিন্তু কি শিখে নিচ্ছে তারা? আদিতে যে সকল সাধক ব্যক্তিত্বের চরম ত্যাগে বাংলা সংস্কৃতি রচিত হয়েছিল সেই সংস্কৃতির মূল মন্ত্র তো অনেক আগেই পাল্টে গেছে। যেখানে শিশুদের শিক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল ধর্ম দিয়ে, সেখানে আজ কী হচ্ছে। আগে তো শিশুরা ভোরে কুরআন শিক্ষার জন্য মসজিদে যেত কিন্তু আজ কি অবস্থা? শিশুরা কিছুটা বুঝার বয়সে উপনীত হলে স্কুল শিক্ষার পাশাপাশি এখন তাদের গানের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়।

অতএব, বিজ্ঞ পাঠকগণ ধর্ম শিক্ষা আর সাংস্কৃতিক শিক্ষাকে পাশাপাশি রেখে অবশ্যই ভাববার দরকার আছে, কোন শিক্ষাটিকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। আর ধর্মীয় শিক্ষার এই তুলনামূলক অভাবে এই শিশুরাই যে এক সময় লাগাম ছাড়া হয়ে বসে এতে কোন দ্বিমত নাই। মানুষের ধ্যান, জ্ঞান আর সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের রুচির পরিবর্তন আসে এটা সত্যি। কিন্তু তার ফলে যে শালীনতা ক্ষুন্ন হবে এটা কোন ক্রমেই কাম্য নয়। তাই এ সমস্ত অবস্থা সামনে রেখে একজন বিবেকবান মানুষের সঠিক কাজটি করা যেন সময়ের দাবি।

**শাহ এহ্‌সান উদ্দিন**
ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

# তাজা ফলের রস : অনেক রোগের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক সুরক্ষা

মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে অশেষ নিয়ামত সৃষ্টি করেছেন, আমাদের দান করেছেন অগণিত রিযিক। যার মধ্যে অন্যতম হল "ফল"। তাজা ফল যেমন উপাদেয় খাবার, তেমনি স্বাস্থ্যের জন্যেও খুবই উপকারী। ফল এবং ফলের রস উভয়ই আমাদের জন্য অনেক পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত। কোমল পানীয় Cold Drink থেকে তো অবশ্যই অবশ্যই অজস্র গুণ ভালো। আসুন আমরা কয়েকটি ফলের উপাদান ও উপকারিতা সম্পর্কে জেনে নেই।

**আপেল :** আপেল ভিটামিনের উত্তম উৎস নয়, কিন্তু এতে প্রচুর পরিমাণ খনিজ দ্রব্য বিশেষ করে পটাশিয়াম (Potassium) এবং ফসফরাসের (Phosphorus) উপস্থিতি রয়েছে। এই ফলের রস রক্ত পরিষ্কারক ( Blood Purifier) এবং সাধারণ বলকারী ঔষধ (General tonic) হিসেবে কাজ করে, আপেলের রস ত্বক, কিডনি পরিপাক তন্ত্রের (Digested system) উপর ভাল কাজ করে। আপেলের রসের মালিক (malice) এবং ট্যানিক (Tannic) এসিড অন্ত্রের জন্য উপকারি। এমন সব সুফল সত্ত্বেও আপেলের রস পানের ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত। কারণ বাজারে যে আপেল বিক্রি হয় তা বেশ পুরনো, এছাড়া এসব আপেলে বিষাক্ত কীট নাশক (Pesticide) এবং ছত্রাকনাশকের (Fungicides) উপস্থিত আছে।

**নারিকেল :** নারিকেলের পানি প্রাকৃতিক খনিজ লবনের একটি বিশুদ্ধ এবং বিপুল উৎস, নারিকেলের পানি মূত্র বর্ধক (Duarte) বিধায় এটি প্রস্রাবের সমস্যা এবং কিডনির পাথরের জন্য উপকারি। এর পানি জীবানু নিরোধক এবং কলেরার চিকিৎসার জন্যেও উপকারি।

**গাজর :** গাজর শরীরকে মাত্রাতিরিক্ত শ্লেষ্মা (Mucus) হোক মুক্ত করার ১টি কার্যকরী সবজি। গাজর রসের গুণাবলী নিম্নে দেওয়া হল : * এটা ক্ষুধা উদ্রেককারী এবং হজমে (Digestion) সহায়ক। * প্রতিদিন এক পাইন্ট (Pint-2pint=2.42 লিটার) গাজর

সেবনে দাঁত এবং হাড়ের কাঠামোর উন্নতি বিধান করে। "Raw Vegetable" গ্রন্থের লেখক নরম্যান ওয়াকার (Norman walker) বলেন, ১ Pint গাজর রসে ২৫ পাউন্ড ক্যালসিয়াম টেবলেটের তুলনায় অধিক গঠনমূলক উপাদান রয়েছে।

* স্তনে দুধ বাড়ায়। * পাকস্থলীর ক্ষত এবং ক্যান্সারের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

* চক্ষু, গলা, টনসিল, সাইনাস এবং শ্বাসনালীর সংক্রমণে (Infaction) বাধার সৃষ্টি করে। অল্প কথায় বলতে গেলে গাজরে প্রচুর কেরোটিন (Beta caroten) ভিটামিন (vitamin) এবং খনিজ (Mineral) পদার্থ আছে।

**পেয়ারা :** আপনি যদি প্রচুর ভিটামিন সি পেতে চান তাহলে প্রচুর পেয়ারার রস পান করুন। কমলালেবু সহ যে কোন ফল থেকে এতে ভিটামিন সি বেশি পরিমাণ আছে। পেয়ারার রস কোষ্টকাঠিন্য মুক্ত করে কিন্তু বেশি খেলে কোষ্ট কাঠিন্য বাড়িয়ে তোলে, ইহা ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং তন্ত্রের কৃমি ধ্বংস করে।

**তরমুজ :** তরমুজের অধিকাংশ পানি। এতে আঁশ নেই বললেই চলে। সুতরাং এটাকে রস বা ফল হিসেবে খাওয়া হোক না কেন উপকারের কোন হেরফের হয়না। সাধারণত এটি ঠান্ডা এবং মূত্রবর্ধক। কোষ্টকাঠিন্য দূর করতে সহায়তা করে। লেবুর রসের সঙ্গে তরমুজ মিশিয়ে খেলে শরীরের বাড়তি ইউরিক এসিড দূর করতে সহায়তা করে।

**লেবু :** শরীর পরিষ্কারের জন্য লেবুর রসের কার্যকারিতা সম্পর্কে ফলের রস পানের সুপারিশকারী ও ভেষজবিদরা অভিন্ন ভাষায় এর প্রশংসা করেছেন। জ্বর এবং দেহের যে কোন প্রদাহে লেবুর রস কার্যকরী। লেবুর রস দেহ থেকে ফোড়া এবং অন্যান্য চর্মরোগ মুক্ত করতে সাহায্য করে। লেবু হজমি শক্তি বাড়ায় এবং দেহের ক্ষত সারাতে সাহায্য করে।

**কমলা লেবু :** কমলালেবুতে যথেষ্ট পরিমাণ বায়োফ্লেভনয়েডস (Bioflavonoids) আছে। যা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী পদার্থ, কিন্তু এর অধিকাংশই কমলালেবুর খোসায় থাকে, রসে নয়। কমলালেবুর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গাছে পাকে।

**পেঁপে :** আপনি যদি প্রচুর পরিমাণ বিজারক (Enzyme) পেতে চান তাহলে কাঁচা পেঁপে থেকেই তা পেতে পারেনা পা পেইন (Papain) নামে পরিচিত পেঁপে বিজারক (Enzyme) এর রয়েছে প্রোটির হজমের বিপুল ক্ষমতা। তাই যাদের হজমে সমস্যা রয়েছে পেঁপের রস পানে তারা যথেষ্ট উপকৃত হতে পারেন। উদ্ভিদে ফিব্রিন (Fibrin) নামক এনজাইম বিরল হলেও পেঁপেতে এর উপস্থিত লক্ষ্য করা যায়। ফিব্রিন (Fibrin) রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে। সে কারণে শরীরের ভেতরের ও বাইরের জখম দ্রুত নিরাময় করে, কাঁচা পেঁপের রস আলসার ও অধিকতর মারাত্মক সমস্যা সহ তান্ত্রিক বৈকল্য ((Intestinal disorder) স্বল্পতম সময়ে নিরাময় করে। পাকা পেঁপের রস পেটের জন্য অনেক ভাল ফলদায়ক।

**আনারস :** আনারস ব্রমেলিন (Brome lain) নামক হজমী বিজারকে (Digaster) বিপুলভাবে সমৃদ্ধ। এর রস গলা ব্যাথা (sore throat) এবং ব্রংকাইটিস (Bronchitis) এর সমস্যা উপসমে উপকারী। এটি অতিরিক্ত শ্লেষ্মা (Mucus) গলিয়ে দেয়। মূত্র বর্ধক (Diuretic) হিসেবে আনারসের রস কিডনীর জন্য উপকারী।

**টমেটো :** টমেটোর যে বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল লাল রসালো গাছ পাকা টমেটোর ভিটামিন ও খনিজের সমৃদ্ধতম উৎস, এ জাতীয় টমেটো থেকে প্রচুর রস পাওয়া যায় যা ডায়াবেডিস রোগীর জন্য ভালো। রান্না করার ফলে দীর্ঘ মেয়াদী টমেটো এসিড অজৈব (Inorganic) এবং ক্ষতিকর (Detrimental) হয়ে পড়ে। এর চেয়ে টমেটো টুকরা করে একটু গরম মশলা বা বা চাট মশলা লবন ও চিনি দিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে ছেঁকে শরবত খাওয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্য সম্মত।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে দিয়েছেন তার অশেষ এক নিয়ামত রাজি। সৃষ্টি করেছেন উপকরি ও সুস্বাদু হরেক রকমের ফল। আমাদের দেহ সুস্থ রাখতে এবং রোগ থেকে বাঁচতে হলে এই সকল নিয়ামতের সুষ্ঠু ব্যবহার করা উচিত। বাজারের অন্যান্য কোমল পানীয় বা জুস পান করার চেয়ে যদি এইসব ফলের রস পান করি তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের দেহকে অনেক রোগ থেকে মুক্ত রাখতে পারব, ইনশাআল্লাহ্।

সংগ্রহ : **নওশিন আনজুম তানিয়া**

[মাসিক গণস্বাস্থ্য, আগষ্ট ২০০৪, থেকে সংগৃহীত]

## শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রবীনতম সদস্য জনাব ফজল আহমদ গত ১৭ই মে' ২০১১ দুপুর অনুমানিক ১২.৩৫ ঘটিকায় তাঁর ঘাটফরহাদবেগস্থ নিজস্ব বাসভবনে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

একই দিন আর্থাৎ ১৭ই মে' মঙ্গলবার বাদ আসর চট্টগ্রামস্থ বায়তুল বাসেত মসজিদ প্রাঙ্গনে তাঁর নামাযে জানাযা শেষে আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের মুরাদপুরে অবস্থিত কবরস্থানে মরহুমের দাফন সুসম্পন্ন হয়।

মরহুমের জানাযা এবং দাফনে চট্টগ্রামের আহমদী ও স্থানীয় বহু গয়ের আহমদী ভাইরা অংশ গ্রহণ করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, মরহুম ফজল আহমদ একনিষ্ঠ তবলীগকারী এবং আহমদীয়াতের জন্য ফিদায়ী ও সুন্দর প্রকৃতির মনের উৎসাহী মানুষ ছিলেন। তাঁর বহুল কর্মময় জীবনের সিংহভাগ সময় তিনি তবলীগের পিছনে ব্যয় করেন, যার মাধ্যমে বহু লোক আহমদীয়াত গ্রহণের ও সত্যের আলোর সন্ধান পেয়েছেন।

আমরা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করি এবং আল্লাহ তাআলা যেন মরহুমকে বেহেশ্‌তের উচ্চ মোকাম ও তার পরিবারবর্গকে সবরে জামিল দান করেন সেজন্য সবার কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

**খালেদ আহমদ সিরাজী**
সেক্রেটারী ইশায়াত, চট্টগ্রাম।

# সং বা দ

## লালমনিরহাট জামা'তে খিলাফত দিবস উদযাপন

গত ২৭/৫/২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত লালামনিরহাট-এর উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালিত হয়। খিলাফত দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন সবুজ আহমদ। নযম পরিবেশন করেন নাজিফ আহমদ। খিলাফত দিবসের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব সবুজ আহমদ, মাহমুদ আহমদ নিবিড়, গিয়াস উদ্দিন আহমদ এবং সাইদ আহমদ। পরিশেষে সভাপতির গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

**মাহমুদ আহমদ নিবিড়**

## পুরুলিয়ায় খিলাফত দিবস পালন

গত ২৭/০৫/১১ তারিখ বাদ জুমুআ পুরুলিয়া জামা'তের উদ্যোগে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব সালেহ আহমদের সভাপতিত্বে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব রাসেল আহমদ, দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। নযম পাঠ করেন রাকিবুল ইসলাম শান্ত। তারপর খিলাফত দিবস প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মৌ. শামীম আহমদ, মোয়াল্লেম এবং জনাব আল আমীন হক তুষার, (কায়েদ)। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪০ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

**আল আমীন হক তুষার**

## তেজগাঁও জামা'তে খিলাফত দিবস পালিত

গত ২৭/৫/২০১১ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেজগাঁও-এর উদ্যোগে তেজগাঁও জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ-এর সভাপতিত্বে স্থানীয় জামে মসজিদে খিলাফত দিবস পালিত হয়। উক্ত দিবসের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম। নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ আবদুল করিম। বক্তৃতা পর্বে খিলাফত দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব মাকসুদ-উল-হক। মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমন, স্থানীয় মোয়াল্লেম বক্তব্য রাখেন ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ প্রসঙ্গে। নযম পেশ করেন জনাব আলহাজ্জ মোহাম্মদ কায়সার আলম। খিলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন। এ পর্যায়ে নযম পাঠ করেন জনাব জোবায়ের আহমদ। যুগ খলীফার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আলহাজ্জ মোহাম্মদ কায়সার আলম। সবশেষে সভাপতি ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব, খলীফার আনুগত্য খলীফাতুল মসীহদের গুরুত্বপূর্ণ নসিহতের আলোকে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

**আলহাজ্জ মোহাম্মদ কায়সার আলম**

## ফতুল্লা জামা'তে খিলাফত দিবস পালিত

গত ২৭/৫/২০১১ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ ফতুল্লা জামা'তের উদ্যোগে 'মসজিদ নূর'-এ খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসের শুরুতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মুসলিম উদ্দিন আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ তারিখ হোসেন। উক্ত দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব আবুল হাসেম বীর প্রতীক। জনাব শাহ্ বাহাউদ্দীন শিবলী। মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। সবশেষে সভাপতি জনাব কাজী মোবাশ্বের আহমদ সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত দিবসে প্রায় ৪৫ জন সদস্যা/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। এরপর দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

**মুহাম্মদ আমীর হোসেন**

## রংপুর জামা'তে খিলাফত দিবস পালিত

গত ২৭/০৫/২০১১ তারিখে বাদ জুমুআ রংপুর স্থানীয় মসজিদে খিলাফত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এর উপস্থিতিতে এ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. জাকির হোসেন, মোয়াল্লেম। দোয়ার মাধ্যমে দিবসটির সূচনা করা হয়। উক্ত দিবসে খিলাফত দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব মসিহাজ্জামান (শাহীন), মোহাম্মদ আব্দুল গনি, মোহাম্মদ মনওয়ারুল হক, মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ্ সিকদার, মৌ. জাকির হোসেন এবং মোহাম্মদ মাহবুবুল ইসলাম প্রমুখ। পরিশেষে সভাপতির বক্তব্য, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত দিবসে মোট ২১ জন উপস্থিত ছিলেন।

**প্রেসিডেন্ট**

## তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৫/৫/২০১১ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলীর বিশেষ পকেট দর্শনায় নও-মোবাঈনদেরকে নিয়ে জনাব আবুল বাশার মিয়ার বাড়ীতে একটি তরবিয়তী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। জনাব আব্দুল গফুর প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে উক্ত তরবিয়তী সেমিনারের ব্যবস্থা করা হয়। এতে বেগমপুর, ঘুঘুডাঙ্গা, দর্শনা বাজারের নও মোবাঈন ভ্রাতাগণ একত্রিত হন। বিভিন্ন বিষয়ে তরবীয়তের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু, মোয়াল্লেম। পরিশেষে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট-এর নসিহতমূলক বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

**মুয়াযযেম আহমদ সানী**

## ১০ম রিজিওনাল ওয়াকফে নও ক্লাস ২০১১ অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন

গত ১৭/৫/১১ইং হতে ২১/৫/১১ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী ১০ম রিজিওনাল ওয়াকফে নও ক্লাস অত্যন্ত সফলতার সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত মহতী ক্লাসে অত্র অঞ্চলের ১০টি জামা'ত হতে ৬০ জন ওয়াকফে নও এবং ৩০ জন পিতা-মাতা উপস্থিত থেকে ক্লাস করেছেন। জামা'তসমূহ হল–ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তারুয়া, ক্রোড়া, তালশহর, বিষ্ণুপুর, শালগাঁও, দূর্গারামপুর, আখাউড়া, ঘাটুরা ও জামালপুর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৭/৫/১১ তারিখ বাদ মাগরীব জনাব মীর মোবাশ্বের আলী ভারপ্রাপ্ত আমীর এবং নায়েব ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং নযম পরিবেশনের পর উপস্থিত থেকে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব হালিম আহমদ হাজারী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ এবং জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ২১/৫/১১ তারিখ সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের পর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার। নসিহতমূলত বক্তৃতা প্রদান করেন মওলানা নওশাদ আহমদ, মোবাশ্বের মুরব্বী। ৫ দিন ব্যাপী এই ক্লাসে ওয়াকফে নওদের পাঠদান করেন যথাক্রমে–মওলানা নওশাদ আহমদ, মৌ. এনামুল হক রনি, মৌ. খলিলুর রহমান, মৌ. আব্দুল হাকীম, মৌ. আসাদুল্লাহ্ আসাদ, সর্বজনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, তৌফিক সরকার, এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, সিদ্দিক আহমদ খালেদ, এস, এম, এরফান এবং বশির আহমদ। পাঠদানের মধ্যে ছিল–কুরআন, হাদীস, বক্তৃতা (বাংলা, ইংরেজী, উর্দু), উর্দু শিক্ষা, পুস্তক আলোচনা, দ্বিনী মালুমাত, আজান, ইকামত, আহমদীয়াতের ইতিহাস। ক্লাস শেষে পরীক্ষা নেওয়া হয়। এছাড়া এতে এস, এস, সি এ প্লাস এবং ৫ম ও অষ্টম শ্রেণীর ১ম বিভাগ প্রাপ্তদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

**মোস্তাক আহমদ খন্দকার**

## তারুয়ায় তালিম তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৫/০৫/২০১১ তারিখে মধ্যপাড়া হালকায় জনাব ডা: মোসাদ্দেক-এর বাড়ীতে বাদ মাগরীব তালিম তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব শামসু মিয়া। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ইসমতুল্লাহ্ মিয়াজী। নযম পেশ করেন শামিম আহমদ। ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব খলিলুর রহমান, জনাব জহির আহমদ মিয়াজী, স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম মৌ. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। সবশেষে দোয়া ও আপ্যায়নের মাধ্যমে সভা সমাপ্তি করা হয়।

**শামসু মিয়া**

## তেজগাঁও জামা'তে নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ৩/৬/১১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ তেজগাঁও জামে মসজিদে লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে চতুর্থ নাসেরাত দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও নাসেরাতের আহাদনামা পাঠের মধ্য দিয়ে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত দিবসে ১৪ জন লাজনা এবং ১১ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া নাসেরাত সেক্রেটারী বাংলাদেশ এবং তরবিয়ত সেক্রেটারী বাংলাদেশও উপস্থিত ছিলেন। নাসেরাত দিবসে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। দিবস উপলক্ষ্যে মসজিদ খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়।

দিবসের শেষের দিকে স্থানীয় মোয়াল্লেম, নাসেরাত সেক্রেটারী, তরবিয়ত সেক্রেটারী এবং স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট নাসেরাতদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। এরপর প্রতিযোগিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে নাসেরাত দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

**ভিকারুন নেছা লুনা**

## মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার ৯ম জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৬ ও ৭ই মে রোজ শুক্র ও শনিবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার ৯ম জেলা ইজতেমা উথলীস্থ বায়তুস সোবহান মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব শামসুল হক টিপু, মুআবিন সদর-৪। অত:পর মুয়াযযেম আহমদ সানী-এর কুরআন তেলাওয়াত ও পরে সম্মিলিত আহাদ পাঠ করা হয়। উক্ত অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নসিহত মূলক বক্তব্য দেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মোজাফ্ফর আহমদ রাজু। এরপর নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব নিয়ে বিশেষ বক্তৃতা রাখেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল গফুর, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। সভাপতির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সবাই মনোযোগ সহকারে হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনেন। খুতবা শেষে মাগরীব এশা নামায জমা করা হয়। নামায শেষে পুণরায় প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

৭ মে শনিবার নামায তাহাজ্জুদের ব্যবস্থা করা হয়। তাহাজ্জুদ, ফজর নামায ও ব্যক্তিগত কুরআন পাঠের পর পুণরায় বাকী প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব শামসুল হক। প্রধান অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ আব্দুল গফুর, বিশেষ অতিথি ছিলেন মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু মোয়াল্লেম এবং মৌ. লুৎফর রহমান মোয়াল্লেম শৈলমারী। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির বক্তব্য শেষে সভাপতির বক্তব্যের পর শুরু হয় পুরস্কার বিতরণ। পুরস্কার বিতরণ শেষে আহাদ পাঠের মাধ্যমে ৯ম বার্ষিক ইজতেমা শেষ হয়। এতে বৃহত্তর কুষ্টিয়ার ৪২ জন খোদ্দাম, আতফাল উপস্থিত ছিলেন।

**মুয়াযযেম আহমদ সানী**

## নারায়ণগঞ্জ-এর ১২তম ওয়াকফে নও তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন-২০১১ অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জে ১২তম ওয়াকফে নও তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন গত ৯/৪/১১ তরিখ হতে ১৫/৪/১১ তারিখ পর্যন্ত সুন্দর ও সুশৃংখল ভাবে সম্পন্ন হয়। উক্ত ক্লাসের উদ্বোধন করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব হালিম আহমদ হাজারী। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে সিকদার সানী ও ফালাউদ্দিন আহমদ। এতে বক্তব্য রাখেন জনাব মোজাফফর আলী, জনাব মনিরুজ্জামান, জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা পাটওয়ারী এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের। বক্তাগণ ওয়াকফে নওদের উদ্দেশ্য এবং পিতা-মাতাগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। ক্লাস পরিচালনা ও শিক্ষকতার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন মৌ. আমীর হোসেন, মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের ও জনাব আহমদ আলী। ১৫/৪/১১ তারিখ অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনের মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপী ওয়াকফ নও কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন ১ম স্থান অধিকারী ওয়াকফে নও সন্তান ফালাহ উদ্দিন আহমদ ও মরিয়ম সিদ্দীকা। সমাপ্তি অধিবেশনে যথাক্রমে বক্তব্য রাখেন মৌ. হাফেয আবুল খায়ের, স্থানীয় আমীর মঈনউদ্দিন আহমদ। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন ওয়াকফে নও সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা পাটওয়ারী। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন সভাপতি। তিনি সন্তান ও পিতামাতাদের উদ্দেশ্যে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। পরিশেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

**মোহাম্মদ মোস্তফা পাটওয়ারী**

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে দ্বিতীয় তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ৭ মে থেকে ৯ মে ২০১১ পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস সাফল্যের সাথে সুসম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত, আহাদনামা পাঠ, হাদীস পাঠ, নযম ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত তালিম তরবিয়তী ক্লাসের উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন বিলকিস তাহের, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। উক্ত ক্লাসে বিভিন্ন তালিম তরবিয়তমূলক বক্তৃতা প্রদান করা হয়। দরূদ শরীফ পাঠের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করেন আফরোজা মতিন। কল্যাণ সাধনের উপায় সমূহ কি কি, প্রকৃত বীরত্ব, সবুর ও সহানুভূতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন নাছিমা বশির। কিভাবে আমরা কুরবানীর মান বাড়াতে পারি এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রিনাত ফৌজিয়া। তওবা ও ইস্তেগফারের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য দেন সুরাইয়া সালমুন। সত্যবাদিতা সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন কুররাতুল আইন। লাজনা বোনদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট। ক্লাসে সহীহ্ কুরআন শিক্ষা ক্লাস, কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা ও কুইজ প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। উক্ত তালিম তরবিয়তী ক্লাসে প্রথম দিন ৬৩ জন, ২য় দিন ৪৬ জন এবং তৃতীয় দিন ৬১ জন লাজনা বোন উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে তিনদিন ব্যাপী এই তালিম তরবিয়তী ক্লাসের সমাপ্তি হয়।

**মিলা পাটোয়ারী**

## সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান প্রদর্শন ও তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বগুড়ার পকেট বাগবাড়ীতে গত ২৯/০৪/২০১১ প্রথমবারের মত হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা ও সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান দেখানো হয়। দর্শকগণ খুব ধৈর্যের সাথে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে প্রায় ২ ঘন্টা জামা'তে আহমদীয়া সম্পর্কে আগত মেহমানদের জানানো হয় এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। মেহমানগণ ঐ রকম অনুষ্ঠান বার বার করার জন্য অনুরোধ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৪ জন আহমদী ৫ জন নও মোবাঈন সহ ৪৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

**মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম**

## খুলনায় খিলাফত দিবস পালিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনার উদ্যোগে গত ২৭-০৫-২০১১ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক-এর সভাপতিত্বে দারুল ফজলস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে খিলাফত দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মসিউল আলম খান এবং নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ মফিজুর রহমান। অত:পর খিলাফত প্রতিষ্ঠা, খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব এস, এম মঞ্জুরুল আলম ও মৌ. শাহ আলম খান। সবশেষে সভাপতি ঐশী খিলাফতের কল্যাণ ও বর্তমান বিশ্ব এই ঐশী খিলাফত হতে কি আশীষ লাভ করছে, তা ব্যাখ্যা করেন এবং জামা'তের সদস্যদেরকে এই ঐশী খিলাফত হতে বেশি বেশি কল্যাণ লাভের জন্য খিলাফতের রজ্জুকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে নিজেদের জীবন পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অত:পর দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত আলোচনা দিবসে মোট ৫৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

**জি, এম, মুশফিকুর রহমান**

## দূর্গারামপুরে খিলাফত দিবস পালিত

গত ০১/০৬/১১ রোজ বুধবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত দূর্গারামপুরে বাদ মাগরীব হতে রাত ৯-৩০ মি: পর্যন্ত খিলাফত দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট ডা: মোহাম্মদ তৌফিক-ই-ইলাহী। অনুষ্ঠানের প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মেহেদী সুলেমান। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব আবু বকর সিদ্দীক। ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব এ বিষয়ে আলোচনা করেন বেলাল আহমদ, জনাব আবু বকর সিদ্দীক, জনাব আব্দুল হাই এবং মৌ. মোজাম্মেল হক, মোয়াল্লেম। সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শেষ করা হয়।

**ডা: মোহাম্মদ তৌফিক-ই-ইলাহী**

## বড় বাইশদিয়ায় খিলাফত দিবস পালিত

গত ২৭ মে শুক্রবার বাদ জুমুআ বড়বাইশদিয়ায় খিলাফত দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব গাজী ওমর ফারুক, যয়ীম, মজলিস আনসারুল্লাহ্, বড় বাইশদিয়া। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব রাকিব সিকদার। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুর রব আকন খিলাফত দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। খাকসার সভাপতির ভাষণে খিলাফতের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করি। দোয়ার মাধ্যমে খিলাফত দিবসের কার্যক্রম শেষ হয়।

**গাজী ওমর ফারুক**

## ঘাটুরা জামা'তে খিলাফত দিবস পালিত

গত ২৭ মে শুক্রবার হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবার পর ঘাটুরা জামা'তে মহান খিলাফত দিবস অত্র জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মুজিবুর রহমান লস্কর-এর সভাপতিত্বে শুরু হয়। উক্ত দিবসে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এস, এম, সেলিম। খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন জনাব উজ্জল আহমদ, খিলাফতের আনুগত্যের ফলাফল বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন মৌ. এনামুল হক রনী, মোয়াল্লেম। উর্দু নযম পেশ করেন জনাব এস, এম, সুলতান ও বাংলা নযম পেশ করে জনাব রাশেদ লস্কর। সভাপতির ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে খিলাফত দিবসের কার্যক্রম শেষ করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ৮৫ জন।

**এনামুল হক রনী**

## শ্যামপুরে খিলাফত দিবস উদযাপিত

গত ২৭ মে ২০১১ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শ্যামপুরের উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোজহারুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে উক্ত দিবসের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এতে শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শরীফ আহমদ। বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুল মালেক, জনাব মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম, জনাব মোহাম্মদ আতা এলাহী শুভ। নামায ও খাবারের পর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় এতে প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম, উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব নাসের আহমদ, বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ আবদুল করীম, বক্তব্য রাখেন জনাব ফিরোজ আহমদ, জনাব এ্যাড. সিরাজ আহমদ, জনাব মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম, জনাব মোহাম্মদ আব্দুল করীম, জনাব মোহাম্মদ আজম আলী, জনাব মোহাম্মদ আবুল কাশেম, মওলানা আব্দুল হাই, মৌ. আব্দুর রহমান রানু, মোয়াল্লেম ও সভাপতি। বক্তাগণ খিলাফতের কল্যাণ ও এতায়াতে নেযাম, খিলাফত কায়েম রাখায় আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, খিলাফত ঐক্য ও বিজয়ের হাতিয়ার প্রভৃতি বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে খিলাফত দিবসের কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে মোট ৭০ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

**মোজহারুল ইসলাম**

## নারায়ণগঞ্জ জামা'তে খিলাফত দিবস পালিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় গত ২৭ মে ২০১১ খিলাফত দিবস পালিত হয়। স্থানীয় আমীর জনাব মইনউদ্দিন-এর সভাপতিত্বে উক্ত দিবসে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ওমর আহমদ আদর, নযম বাংলা ও উর্দু আবৃত্তি করেন যথাক্রমে ফালাহ্ উদ্দিন ও সাইফুল আলম বিপুল। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। অত:পর বক্তৃতা পর্বে খিলাফত দিবস ও খলীফার আনুগত্য বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন জনাব ডা: মোজাফফর উদ্দিন আহমদ, আহমদীয়া জামা'তে খিলাফতের স্থায়ীত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব কমর উদ্দিন সানী। ২৭ মে'র গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুল্লাহ্ আল মামুন। খিলাফতের মাধ্যমে বরকত ও কল্যাণ এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা পাটওয়ারী। খলীফার মর্যাদা বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মনিরুজ্জামান। ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খিলাফত এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের। সভাপতির ভাষণে খিলাফতের ঐতিহাসিক রূপরেখা, আদর্শ, গুরুত্ব, তাৎপর্য শিক্ষা ও খলীফার আহ্বানে এক সূত্রে একক নেতৃত্বে সমাসীন থাকার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ সম্পন্ন করেন। উক্ত দিবসে ৯৩ জন দর্শক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

**মোহাম্মদ মোস্তফা পাটওয়ারী**

## ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় খিলাফত দিবস উদযাপিত

গত ২৭ মে ২০১১ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে খিলাফত দিবস মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠ করেন যথক্রমে জনাব কাওসার আহমদ ও জনাব বশির আহমদ মিঠু। প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব শাহজাদা খান। দিবসটির উপর বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন যথাক্রমে মৌ. আসাদুল্লাহ্ আসাদ, মোয়াল্লেম, মওলানা নওশাদ আহমদ, মোবাশ্বের মুরব্বী ও জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার। সবশেষে সভাপতির বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত দিবসে সর্বমোট উপস্থিত ছিলেন ৩৮৩ জন।

**মঞ্জুর হুসেন**

بسم الله الرحمن الرحيم

# এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

| তারিখ | জুলাই ২০১১ MTA বাংলা অনুষ্ঠান সূচী | বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টা থেকে |
|---|---|---|

হুযুরের (আইঃ) জুমুয়ার খুতবার সরাসরি বাংলা সম্প্রচার সহ MTA দেখুন ইন্টারনেটেঃ
http://www.mta.tv

অনুষ্ঠান বিষয়ে আপনার মুল্যবান পরামর্শ পাঠানঃ আহমদ তবশির চৌধুরী , ইনচার্জ, এম টি এ, বাংলাদেশ স্টুডিও।
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১। Email: atabshir@hotmail.com

## আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

### বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।


সৌজন্যে :

ডিলার- **জনতা সেনেটারী**

হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

**গাজী** গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 73 | 23th Issue

# The Ahmadi
Fortnightly

15 June, 2011 Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12







Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com